জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক
প্রদান অনুষ্ঠান-২০২১ উপলক্ষে
বিশেষ প্রকাশনা

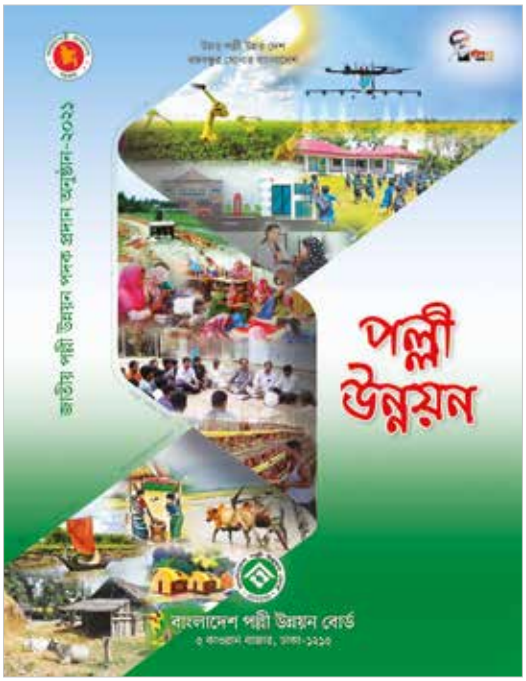

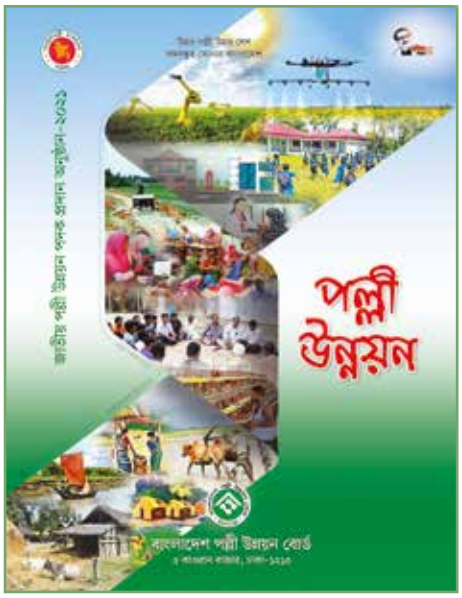

প্রকাশকাল : **অক্টোবর, ২০২১**

উপদেষ্টা

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পৃষ্ঠপোষক

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

নির্বাহী সম্পাদক

এস.এম.মাসুদুর রহমান
পরিচালক (পরিকল্পনা)

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
যুগ্মপরিচালক (আরইএম)

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
কর্মসূচি পরিচালক, পল্লী প্রগতি কর্মসূচি

ফারুক আহমেদ জোয়ার্দ্দার
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিআরডিটিআই, সিলেট

মোঃ নুরুজ্জামান
উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)

মোঃ জিয়াউল হাসান
উপপরিচালক (পরিকল্পনা)

মোঃ আক্কাছ আলী
উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে— এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।"

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“গ্রামকেই করতে হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার মধ্যেই রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথ।”

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর উদ্যোগে 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রদান উপলক্ষে 'পল্লী উন্নয়ন' শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো 'পল্লী উন্নয়ন'। এ লক্ষ্যে জাতির পিতার হাত ধরে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme : IRDP) প্রবর্তিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়নের কর্মকৌশল হিসেবে বহুমাত্রিক ও বহুখাতব্যাপী এ কর্মসূচিটি দেশব্যাপী প্রবর্তন করা হয়। জাতির পিতার আজীবনের লালিত স্বপ্ন বৈষম্যহীন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে আইআরডিপি'র মাধ্যমে অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুণর্গঠনের জন্য ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক মুক্তি ও আয়ের সুষম বণ্টনের জন্য বিআরডিবি তথা তৎকালীন আইআরডিপিকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সরকার বহুমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সরকারের এ বৃহৎ পরিকল্পনায় এক অনন্য অংশীদার।

দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ পল্লী এলাকায় বাস করে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর ন্যায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/সংগঠন/ব্যক্তি পল্লী উন্নয়নের বহুমুখি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে পল্লী দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁদের উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বিআরডিবি কর্তৃক 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রদান একটি প্রসংশনীয় উদ্যোগ। এ উপলক্ষে 'পল্লী উন্নয়ন' শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি পদক প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বহুল প্রতীক্ষিত 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' ২০১২-২০১৮ প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পদক প্রদানের এ মূল্যবান মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত স্মরণিকা প্রকাশের মহতী উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' এ প্রকাশনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে বাংলাদেশের পল্লী এলাকার আপামর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি পল্লী সংগঠন গড়ে তোলা, পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা, আয়বর্ধনমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সামাজিক সম্পদ উন্নয়ন, স্থানীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ক্ষেত্রে বহুমুখি কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে অনুকরণীয় নজির সৃষ্টি করেছে। যেসব ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন, জাতীয়ভাবে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্যাটাগরিভিত্তিক পদক প্রদান করা হলে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি আরো ত্বরান্বিত হবে - যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প JICA Award প্রাপ্ত হয়েছে । এছাড়াও, বিআরডিবি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অ-কৃষি খাতের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। গত ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় দেশের জাতীয় জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি মনে করি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এ স্মরণিকাটি পল্লী উন্নয়ন এবং স্বাবলম্বিতা অর্জনে অভিলাষী ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। এ স্মরণিকা প্রকাশের নেপথ্যে যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধুর' স্বপ্নের এই বাংলাদেশে সিংহভাগ মানুষ পল্লী এলাকায় বসবাস করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পল্লী এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নির্দেশনায় বিশ্বনন্দিত কুমিল্লা মডেলের আলোকে দেশব্যাপী 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)' বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে পল্লীর জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইআরডিপি'কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-তে রূপান্তর করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং পল্লীর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি'র অনেক সফলতা রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সরকারের ম্যান্ডেটধারী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। সরকারের "রূপকল্প-২০৪১" এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অতি দরিদ্রদের অন্তর্ভূক্তিকরণ, দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ, পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা উন্নতকরণ, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ এবং পল্লীর অ-কৃষি কর্মকাণ্ড শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিআরডিবি'র অবদান উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যন্ত পল্লী এলাকায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাচ্ছল্য পৌঁছে দেয়ার জন্য "আমার গ্রাম-আমার শহর"-এর যে ধারণা ব্যক্ত করেছে, তার রূপায়নে বিআরডিবি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে মর্মে আমার বিশ্বাস।

দেশের পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসা ও স্বীকৃতির দাবিদার। পাশাপাশি পল্লী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ সংগঠন ও ব্যক্তির বহুমুখি অবদান অনস্বীকার্য। এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মত জাতীয় পর্যায়ে 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রদান অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে বিআরডিবি কর্তৃক 'পল্লী উন্নয়ন' শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী পালনের এ বছরে 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রদানের এ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি প্রত্যাশা করি, এ উদ্যোগ বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের আরও ভাল কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে। আমি 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রাপ্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০৫.০৪.২০২৩

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ পল্লী এলাকায় বাস করে। তাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নয়নের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে পল্লী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা লাভের পর পল্লী উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে দেশব্যাপী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রর্বতন করেন যার বহুখাতব্যাপী সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়নে ছন্দপতন ঘটলেও জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর তাঁর উদার ও প্রাগ্রসর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়নের চাকা আবারও গতি লাভ করে। তাঁর গৃহীত বহুমাত্রিক উন্নয়ন উদ্যোগের ফলে আজ দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, পল্লী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং পল্লী জীবনে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নানামুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যার সুফল পল্লীর জনগোষ্ঠী ভোগ করছে। সরকার আজ উন্নয়নের মহাসড়কে পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের পল্লী উন্নয়নে যারা অবদান রেখে চলেছেন, জাতীয়ভাবে তাঁদের উত্তম কাজের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যেই "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক"এর অবতারণা।

বিশ্বব্যাপী গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-কে সুবিবেচনায় রেখে স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী, ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে "সোনার বাংলার" রূপায়ন, এবং ২১০০ সালে নিরাপদ ব-দ্বীপের অন্বেষায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সমৃদ্ধির এ অগ্রযাত্রায় পল্লী উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়নে উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রদানের এ আয়োজন।

এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পশ্চাৎপদ পল্লীর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়িত হয় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি যা আইআরডিপি নামে বহুল পরিচিত। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে 'সেচ-সার-বীজ' এর সফল প্রয়োগ ও 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের মাধ্যমে আইআরডিপি কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে আইআরডিপি'র কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় নারী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে। আইআরডিপি'র অভূতপূর্ব সাফল্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে এবং সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গঠিত হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিআরডিবি সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে পল্লীর জনগণকে সংগঠিতকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা, ঋণ ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সেচ ব্যবস্থাপনাসহ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়, পল্লীর ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ, অকৃষিপণ্যের প্রসার, পুষ্টি সমৃদ্ধ অপ্রধান শস্যের উন্নয়ন, পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপন, ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিপুল কার্যক্রমের ক্রমধারায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি আজ অন্যতম বৃহৎ সরকারি সংস্থা।

আমার গ্রাম আমার শহর, এসডিজি-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক ও টেকসই পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র কর্মের ব্যাপ্তি আগামী দিনে আরও বহুমাত্রিক ও বেগবান হবে। ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে সমন্বিতভাবে পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিআরডিবি পল্লীর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে।

দেশের পল্লী উন্নয়নের এ গতিধারায় বিভিন্নভাবে যাদের অবদান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্যকে অনুপ্রাণিত করেছে তাদেরকে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগকে বিআরডিবি পরিবার স্বাগত জানাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজনে লিড এজেন্সি হিসেবে পদকপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'পল্লী উন্নয়ন' স্মরণিকাটি সমসাময়িক পল্লী উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'পল্লী উন্নয়ন' স্মরণিকাটি প্রণয়নের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন এবং যারা লেখনী দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একইসাথে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২১ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং উক্ত অনুষ্ঠানে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শনের আলোকে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল পল্লী গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হোক—এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা থেকে পল্লী প্রধান আজকের বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের পেছনে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার ইতিহাস। এই পথ পরিক্রমায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সরকার রূপকল্প ২০৪১ গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০৪১ হলো স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে প্রণীত একটি জাতীয় রোডম্যাপ যেখানে ভবিষ্যতের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ রূপকল্পকে অবলম্বন করেই আগামী দু'দশকে বাংলাদেশ দ্রুতগতির রূপান্তরধর্মী এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে।

আমরা জানি, গত দেড় দশকে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তথাপি নাগরিক সেবা ও সুবিধার দিক থেকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এখনো ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। তাই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি অগ্রাধিকার হবে গ্রাম-শহরের এই ব্যবধান পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা। এজন্য পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত সুবিন্যস্তভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয়সাধন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পল্লীবাসী তাদের সক্ষমতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনা করে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারলে নিজেদেরকে উন্নত ও টেকসই উন্নয়ন অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা দেশের সকল জনপদ ও জনগোষ্ঠীকে সমহারে ও সমগতিতে সমন্বিতভাবে সরকারের উন্নয়ন গতিধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে চাই। এজন্য পল্লীর সর্বস্তরের জনগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

সাধারণত গ্রাম পর্যায়ে পাড়াকে পল্লীর সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিবেচনায় ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে সরকারি পর্যায়ে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর। অতএব ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততায় প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি বঙ্গবন্ধু মডেল পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা যেতে পারে। যেখানে সরকারের সকল ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল এই মাস্টার প্ল্যানে সম্পৃক্ত থাকবে। বিশেষ করে রূপকল্প ২০৪১ অনুসারে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে উন্নত পল্লী গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু মডেল পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানে পল্লী জনপদ ও জনগণের অবকাঠামোগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবার মান বৃদ্ধিসহ সকল উন্নয়ন উপাদান আমরা বিবেচনা করছি। পল্লী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কার্যকর সমন্বয় ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রশাসনিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পল্লীকে দারিদ্র্যমুক্ত করে উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লীতে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে রোডম্যাপ এর বর্ণনা থাকবে

এ মাস্টার প্ল্যানে।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার ভিন্নতার ভিত্তিতে পৃথক পৃথক উন্নত পল্লীর রূপরেখা এ মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পল্লীর নাগরিক সুবিধা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পল্লীকে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লীতে রূপান্তরই হতে হবে 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনের অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পল্লী এলাকা উন্নত ও সমৃদ্ধ হলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর সহজতর হবে। প্রণীত মাস্টার প্ল্যান সংশ্লিষ্ট জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান বা বিভাগসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় মাঠ পর্যায়ে পল্লী উন্নয়নের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি সারাদেশে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু মডেল পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মূল দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এ ধরনের প্ল্যানের আওতায় সুসম পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ মূল্যায়ন ও তাদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গত পাঁচ দশকে এ ধরনের উদ্যোগ তেমনভাবে গ্রহণ করা হয়নি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বিআরডিবি উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে একটি নীতিমালার আওতায় এ ধরনের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রবর্তন করেছে। পল্লী উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর দশটি ক্যাটাগরিতে এ পদক প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১২ সালে নীতিমালা প্রণয়নের পর থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর পদক প্রদানের মনোনয়ন সম্পন্ন হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তাই আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১২ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মনোনীত ৬২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রদান করতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।

এ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র স্বপ্নগাথা, সাফল্য গাথা, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় সংবলিত সংকলন প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে দেশের উন্নয়ন চিন্তক, গবেষক, উন্নয়ন কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে 'পল্লী উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশনাটিতে গত পাঁচ দশকে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রুরাল প্র্যাকটিশনার ও বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা পরিস্ফুট হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারির মধ্যেও প্রকাশনাটির সফল প্রকাশের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠকদের মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনা ভবিষ্যৎ প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য পাথেয়।

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা হয়। সেই সময়ে দেশের খাদ্য সংকট ছিল প্রকট। দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত । দেশের সেই ক্রান্তিকালীন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়নের পথ বেছে নেন। তিনি সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি স্বনির্ভর দেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনগণের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবন্ধু গ্রাম উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সম্পদের সুসম বণ্টন ও বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠার বিপ্লবকে একসঙ্গে গ্রন্থিত করেছিলেন । উন্নয়নের জন্য এসব ছিল একে অপরের পরিপূরক। দেশের গ্রামীণ উন্নয়নকে সফল করার জন্য তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।
ষাট এর দশকে পল্লী উন্নয়নের নতুন কৌশল/পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে সারাদেশব্যাপী এটিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবে বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের ভিত রচনা করেন। আইআরডিপি'র ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আইআরডিপি'র মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির আওতায় সংগঠিত করে কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিআরডিবি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে সমবায় কার্যক্রমের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়নকল্পে 'সেচ-সার-বীজ' প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় সঞ্চারী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসৃজন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে চলেছে।
বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নির্দেশনায় সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, আরডিএ, বার্ড, বাপার্ড, পিডিবিএফ, এসএফডিএফসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
পল্লী উন্নয়নের এই সকল ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রেখে চলেছেন, জাতীয়ভাবে তাঁদের উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২১ খ্রি. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের মতো জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে "পল্লী উন্নয়ন" শীর্ষক স্মরণিকাটি প্রকাশ করা হলো। এ স্মরণিকার কোনো লেখা বা তথ্য দেশের পল্লী উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়ন কর্মীদের কোনোরূপ কাজে আসলে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ সার্থক হবে মর্মে আমরা মনে করি। এ স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া সম্পাদনা কমিটির সদস্যগণ স্মরণিকা প্রকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এস. এম. মাসুদুর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক
ও
পরিচালক (পরিকল্পনা), বিআরডিবি

সূচিপত্র

"উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ" বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে অনন্য অগ্রদূত - বিআরডিবি : সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু	২১
টেকসই পল্লী উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের রোডম্যাপ : মোঃ রেজাউল আহসান	২৯
বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ভাবনা : ড. আতিউর রহমান	৩৩
গ্রামীণ রূপান্তরের আলেখ্য : ড. হোসেন জিল্লুর রহমান	৩৭
পল্লী উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও বিআরডিবি : কারার মাহমুদুল হাসান	৪০
Rural Development in Bangladesh: A Historical Perspective: Dr. Tofail Ahmed	৪৩
বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন ভাবনাসমূহ : মো. হুমায়ুন খালিদ	৪৮
পল্লী উন্নয়নে একজন জুলিয়ান ফ্রান্সিস : ড. মিহির কান্তি মজুমদার	৫৩
BRDB as a Rural Development Coordinator: Thirty years experiences of Participatory Rural Development Project (PRDP) : Dr. Akira Munakata	৫৫
Rural Development and Local Governance Experience of BRDB and the Sharique Local Governance Project: David Morley	৫৯
সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি : কিছু প্রত্যাশার রূপরেখা : ড. মোঃ হাম্মাদুর রহমান	৬২
ক্ষুদ্র ঋণ ও বিআরডিবি : ড. মুহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী	৬৬
পল্লী উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণ : কোভিড-ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি মানবিক উদ্যোগ : মোঃ সাজেদুল ইসলাম	৬৮
বিআরডিবি'র নবজাগরণে মহাপরিচালকের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ : আলাউদ্দিন সরকার	৭২
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর প্রশিক্ষণ মিশন ভাসানচর-২০২১ : মোঃ আলাউদ্দিন সরকার ও মোহাম্মদ মহিদুর রহমান মোল্লা	৭৭
পল্লী উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও বিআরডিবি'র কার্যক্রম : মোরশেদ আলম	৮১
সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও বিআরডিবি : মোঃ জিয়াউল হাসান	৮৫
স্বাধীন বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : মোঃ শহীদুল ইসলাম	৮৯
বিআরডিবি : বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের অগ্রদূত : দীপক রঞ্জন ভৌমিক	৯২
অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র কার্যক্রমসমূহ ও জিডিপিতে অবদান : শ্যামনগর অভিজ্ঞতা : এস.এম.এ সোহেল	৯৬
চিত্রে বিআরডিবির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড	১০০

“উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ”

বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে অনন্য অগ্রদূত-বিআরডিবি

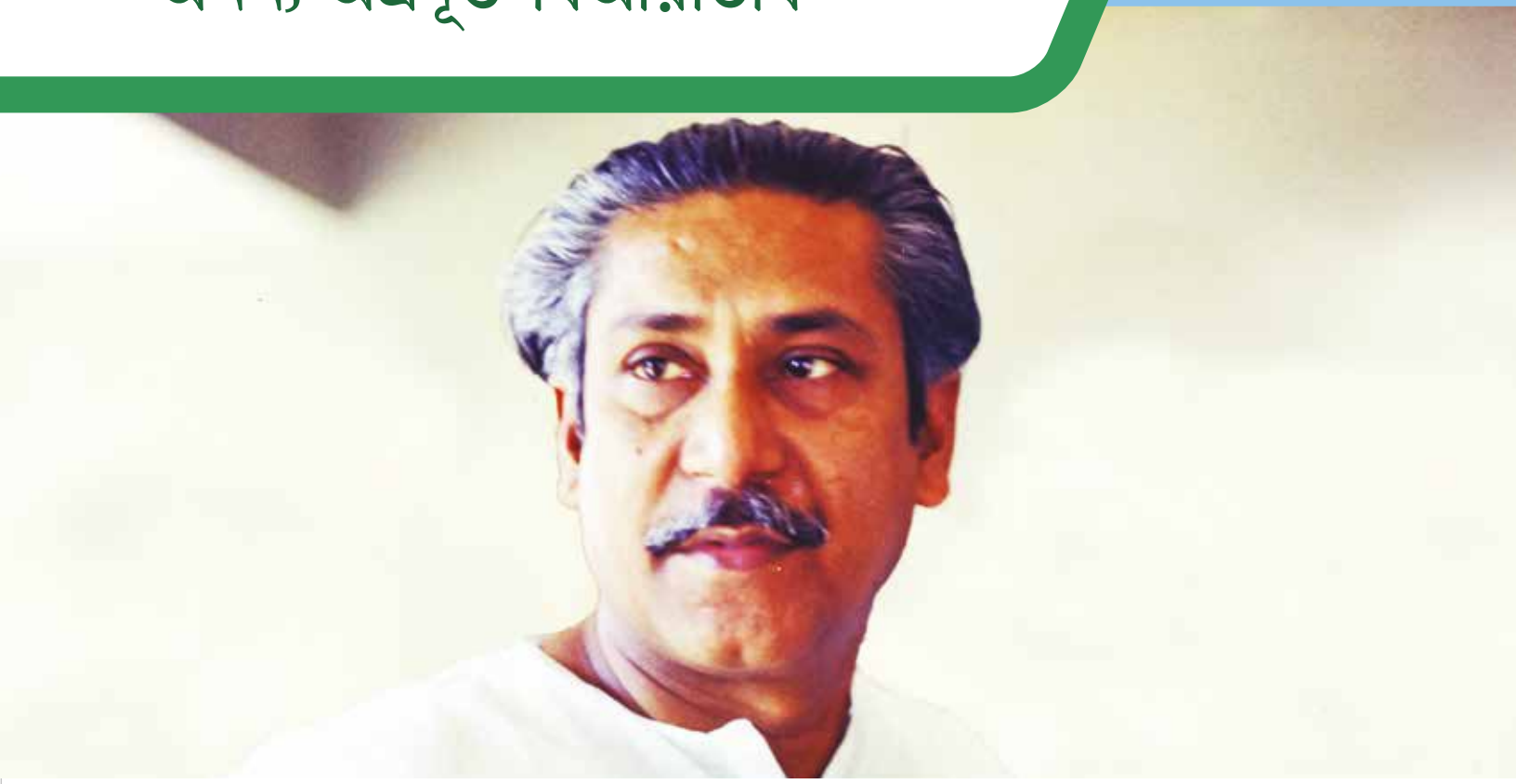

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

১.০ ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে পল্লী প্রধান বাংলাদেশের। সময়ের বিবর্তনে ক্রমবিকাশমান নগরায়ণের প্রভাব সত্ত্বেও আজও দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৬২% এর বাস পল্লী অঞ্চলে। দেশের কৃষি উৎপাদনের প্রায় পুরোটার যোগান দিয়ে থাকে পল্লী বাংলার উর্বর মৃত্তিকা। দেশের নির্মল বায়ু আর অক্সিজেনের ভান্ডার এই পল্লীতেই রয়েছে প্রাণের প্রাচুর্য, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা, রয়েছে ক্রমপ্রসারমান আধুনিকতা ও নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন প্রত্যাশা। স্বাধীন দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো, ভঙ্গুর উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিপর্যস্ত পল্লী অর্থনীতির বাস্তবতাকে সাথে নিয়েই বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশের। কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে পল্লী উন্নয়নের গতিধারা থমকে যায়। পল্লীতে উন্নয়ন কার্যক্রম চলতে

থাকে অ্যাডহক ভিত্তিতে, বিক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে। ফলশ্রুতিতে, দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন - কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। বর্তমান সরকার আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার গতিধারাকে সময়ের ফ্রেমে বেধে 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নত পল্লী গঠন। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের অভিজ্ঞতায় সহজেই অনুমেয় উন্নত পল্লী গঠন একমাত্র পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমেই সম্ভব। এ লক্ষ্যে অনুসরণীয় হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান; যেখানে পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়নের সামগ্রিক ও সময়োপযোগী কলাকৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 'রূপকল্প-২০৪১' এর ভিত হিসেবে প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথার্থই বিধৃত হয়েছে উন্নত পল্লীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রারম্ভিক রূপরেখা। উক্ত রূপরেখার আলোকে অনাগত দিনগুলোতে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এক অনন্য অগ্রদূত হিসেবে বিআরডিবি তার কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

২.০ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শন ও পদক্ষেপ

২.১ সোনার বাংলা গড়াই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের ব্রত

বাংলার কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলেসহ আপামর গণমানুষের অবিসংবাদিত নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অভাব-শোষণ-বঞ্চনার শিকার আর দু'মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করা মানুষগুলোর অধিকার আদায় ও ভাগ্যোন্নয়নের নিরন্তর প্রচেষ্টাই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূলমন্ত্র। তাঁর ভাষায় "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।" বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবেন, চিরদুঃখী বাংলাকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়বেন, এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

২.২ পল্লী উন্নয়ন দর্শনে গ্রামের প্রাধান্য

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে সবসময়ই গ্রাম প্রাধান্য পেয়েছে। সত্তরে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের কথা বিশেষভাবে সংযুক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়কাল পাকিস্তানি জান্তার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ শেষে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশত্যাগী এককোটি নিঃস্ব মানুষকে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন, তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড উপকূল এবং পাকিস্তানি হায়েনাদের রেখে যাওয়া বিধ্বস্ত অবকাঠামো উন্নয়নের মতো অতি নাজুক পরিস্থিতি মোকাবেলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নতুন দেশ গড়ার কাজে হাত দেন।

২.৩ বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিপ্লবের ডাক

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন সমৃদ্ধ কৃষিই পল্লী অর্থনীতি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তিনি তাঁর উন্নয়ন দর্শনে কৃষকের কল্যাণ সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের জীবিকায়নের পাশাপাশি খাদ্য চাহিদা পূরণকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ স্বনির্ভর হবে দেশের অর্থনীতি। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে'। তিনি বলেছিলেন, কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি জানি শোষণ কাকে বলে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু দেশে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। তিনি সমবায়ভিত্তিক সমন্বিত চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করতেন। সমবায় ব্যবস্থা ছিল তার পল্লী উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য। বঙ্গবন্ধু বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি গ্রামে সমবায় গড়া এবং কৃষিজমিতে যৌথ আবাদের নির্দেশনা প্রদান করেন, যেখানে ছিল গরিব মানুষের যৌথভাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিক হওয়ার সুযোগ। তিনি চেয়েছিলেন শোষণ ও কোটারি স্বার্থমুক্ত পল্লী সমাজব্যবস্থা।

বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিধ্বস্ত অবকাঠামো বিনির্মাণ এবং কুটিরশিল্পের বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। গ্রামীণ উন্নয়নে ভূমিসংস্কার এবং জমির মালিকানায় সিলিং নির্ধারণের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলোতেও তিনি মনোযোগ দেন। ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই বঙ্গবন্ধু কৃষকের সকল বকেয়া খাজনার সুদ, এমনকি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেন। কৃষিবিপ্লব বাস্তবায়নের স্বার্থে তিনি জমির মালিকানার সিলিং সর্বোচ্চ একশ' বিঘা নির্ধারণ, উদ্বৃত্ত ও খাসজমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে বণ্টন, পাকিস্তানি শাসকদের দায়েরকৃত দশ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তিদান এবং সুদসহ সকল বকেয়া ঋণ মওকুফ করেন। বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ভাবনার কেন্দ্রে ছিল কৃষি উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান।

২.৪ সংবিধানে পল্লী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও উন্নয়ন দর্শনকে স্বাধীন দেশের স্বপ্নের সাথে একসূত্রে গাঁথার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচনা করেন। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর এ সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয় এবং ৪ নভেম্বর তা অনুমোদিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রথম বর্ষ অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ হতে কার্যকর করা হয় নতুন সংবিধান। এতে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু মানুষের মৌলিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন : "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" [সংবিধান অনুচ্ছেদ-১০]। কিংবা "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"। [সংবিধান অনুচ্ছেদ-১৪]।

সংবিধানে পল্লী উন্নয়নকে বিশেষ প্রাধিকার প্রদান করে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিপ্লব ও গ্রামীণ শিল্পায়নের ডাক দেন : "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" [সংবিধান অনুচ্ছেদ-১৬]।

২.৫ উন্নয়ন পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান

১৯৭৩ সালে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হতে মুক্তি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেন। দ্রুত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের নিয়ে তিনি প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনকে দিয়েই

ফরিদপুরে সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩-১৯৭৮ মেয়াদে স্বাধীন দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দীর্ঘ ছিয়াশি পৃষ্ঠাব্যাপী শিল্পোন্নয়ন, বিশেষত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ শিল্পের বিকাশে মহাকর্মযজ্ঞের ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২-'৭৩ অর্থবছরে দেশের প্রথম উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বড় অংশই বরাদ্দ রাখেন কৃষিখাতের উন্নয়নে। ১৯৭২-'৭৩ অর্থবছরে প্রায় ৫০১ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি নেয়া হয়, যার মধ্যে প্রায় ১০০ কোটিই ছিল কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে, কৃষকদের স্বার্থে।

২.৬ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)'র প্রবর্তন

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপায়িত হয় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) এর দেশব্যাপী সম্প্রসারণের মাধ্যমে। কুমিল্লা মডেলের দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থার আওতায় গৃহীত এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম পর্যায়ে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা। কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কৃষকদেরকে সমবায়ের আওতায় সংগঠিত করা, গ্রাম্য সুদখোর মহাজনের দৌরাত্ম্য থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে টিসিসিএ'র মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও তদারকি ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তন, কৃষকদের শেয়ার-সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজিগঠন, ব্যক্তির কৃষি-উদ্ভাবনকে সমবায়ের মাধ্যমে সম্প্রসারণ, নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী নেতৃত্ব সৃষ্টি, মডেল কৃষক, সমিতির সভাপতি-ম্যানেজার-হিসাবরক্ষক তৈরি প্রভৃতি উদ্দেশ্য আইআরডিপি'র মাধ্যমেই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

৩.০ সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা : 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিসত্তার চেতনাকে ধারণ করে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা সেই অধরা স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপদানে ব্রতী হয়ে নিপুণ দক্ষতায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় এক অবিসংবাদিত অবিকল্প দ্যুতিময় রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশের মাটি-মানুষের উন্নয়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হন।

৩.১ নির্বাচনি ইশতাহার : দিন বদলের সনদ

বঙ্গবন্ধু এমন এক সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে দেশের সকল মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করবে। মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইনের শাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকলে সমানাধিকার ভোগ করবে। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নকে ধারণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনি

ইশতাহারে 'রূপকল্প-২০২১' নিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন।

গত একযুগে তিনি নিম্ন আয়ের বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করেছেন। এই সময়ে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তা মূলত প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার অদম্য সাহস, উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফল। তিনি দেশকে কেবল মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্বসভায় অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেননি, বাংলাদেশকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন একবিংশ শতকের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৫ শতাংশ। গত কয়েক বছরে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল অবিশ্বাস্য। ২০০৮ সালের তুলনায় মাথাপিছু আয় প্রায় তিনগুণ বেড়ে ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২,২২৭ ডলারে।

৩.২ 'রূপকল্প-২০২১'

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে উল্লেখ করা হয়েছিল, ২০২১ সন নাগাদ এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন এ জাতি দেখছে যেখানে একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে। শুধু তাই নয়, এতে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ। গড়ে উঠবে এক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে সরকারের সকল কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এ রূপকল্পের বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শতকরা ১৩ ভাগে নামিয়ে আনার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে বিআরডিবি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

৩.৩ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

দিনবদলের সনদ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর, তৃতীয় মেয়াদে ২০১৮ সালে মাদার অব হিউম্যানিটি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক নির্বাচনি ইশতাহার ঘোষণা করে। এতে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ সোনার বাংলা, স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো এবং ২১০০ সনে নিরাপদ ব-দ্বীপ নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ নির্বাচনি সনদে ১৯টি বিষয়ে সাফল্য অর্জনের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য নির্মূল, ডিজিটালাইজেশন, কৃষির আধুনিকায়ন, দরিদ্রবান্ধব টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অন্যতম। ইশতাহারে দুটি বিশেষ অঙ্গীকার করা হয়। প্রতিটি গ্রামে শহরের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে 'আমার গ্রাম আমার শহর' এবং তরুণ যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তায় 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' ধারণা বাস্তবায়ন।

৩.৪ 'রূপকল্প-২০৪১'

দিনবদলের সনদ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর, তৃতীয় মেয়াদে ২০১৮ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক নির্বাচনি ইশতাহার ঘোষণা করে। প্রতিটি গ্রামে শহরের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে 'আমার গ্রাম আমার শহর' এবং তরুণ যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তায় 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' ধারণা বাস্তবায়ন এ ইশতাহারের বিশেষ অঙ্গীকার। এতে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের সাথে সাথে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ-সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। 'রূপকল্প-২০৪১' বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার একটি রোডম্যাপ যার মূল প্রতিপাদ্য দুইটি- '২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ' এবং 'সোনার বাংলায় দারিদ্র্য হবে একটি অতীত বিষয়'। 'রূপকল্প-২০৪১' এ দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে - ২০৩১ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণ, দারিদ্র্যের ঘটনা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন রাখা এবং আয় বৈষম্য বৃদ্ধির গতি হ্রাস করা। ''রূপকল্প-২০৪১'' এ বিধৃত পল্লী উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দরিদ্রদের আর্থিক সেবাভুক্তি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পল্লী পণ্যের বহুমুখীকরণ, সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন, ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা শুধু ২০৪১ এ থেমে থাকেনি। বরং স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা এবং ২১০০ সালে নিরাপদ ব-দ্বীপ নিশ্চিতকরণে প্রণীত ডেল্টা প্ল্যান তার সুদূরপ্রসারী চিন্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ভিশনারী নেতৃত্বের পরিচয় বহন করে। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে গৃহীত মহাপরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারী কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচিতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৪.০ উন্নত পল্লী সৃজন: উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম পূর্বশর্ত

''রূপকল্প-২০৪১'' অনুসরণে উন্নত বাংলাদেশ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নত পল্লী বিনির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পল্লী উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সরকারের ''সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'' শীর্ষক নির্বাচনি ইশতাহারের অন্যতম অঙ্গীকার হচ্ছে ''আমার গ্রাম-আমার শহর'' যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি গ্রামে শহরের সকল আধুনিক সুবিধাদি দেওয়ার ব্যবস্থাকরণ ও কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার। সরকার গ্রামকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করছে। বিশ্বব্যাপী গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এ সর্বত্র সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান; ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষির প্রসার; জেন্ডার সমতা অর্জনসহ গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল অভীষ্ট টেকসই পল্লী উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিকতার ভিত্তিতে সরকার যথার্থই উন্নত দেশ বিনির্মাণের পূর্বশর্ত হিসেবে উন্নত পল্লী গঠনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৬১.৮% জনগোষ্ঠী পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। কাজেই পল্লীকে বাদ দিয়ে উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। তাই, উন্নত পল্লী বিনির্মাণের অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করা একান্ত অপরিহার্য।

৫.০ উন্নত পল্লী লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন

বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে সেবা প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পদ্ধতি আরো সুসংগঠিত করার সুযোগ রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন পরিহার করে বিভিন্ন অংশীজনের পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিতভাবে বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। তাছাড়া উন্নয়নের সামগ্রিকতা রক্ষা ও টেকসইকরণে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত সুবিন্যস্তভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন হওয়া জরুরি। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার

পথে দেশকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত ''রূপকল্প-২০৪১'' এর অভীষ্টসমূহ অর্জনে পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়ন একান্তই প্রয়োজন যা উন্নত দেশে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান নামে অভিহিত করা হয়। যেখানে পল্লী উন্নয়নের সামগ্রিক উপাদান ও কলাকৌশল বিধৃত থাকে।

৬.০ পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান : পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়নের কৌশল

সাধারণভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার-পাড়া-গ্রাম-ওয়ার্ড-ইউনিয়ন এবং এর আওতাভুক্ত এলাকা, জীবনাচার ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাকে আমরা পল্লী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। পক্ষান্তরে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে সরকারি পর্যায়ে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর। 'রূপকল্প-২০৪১' এর আলোকে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান অঙ্গ পল্লী বাংলার উন্নয়ন তথা উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লী গঠন । সাধারণভাবে গ্রামকে ইউনিট ধরা হলেও একটি গ্রাম কোনোভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজনীয় নির্দেশকসমূহ পূরণ করতে পারে না। সামগ্রিক বিবেচনায় ইউনিয়নকে পল্লীর বৃহৎ ইউনিট বিবেচনাপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা যেতে পারে। সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা এবং সুপরিকল্পিত মাস্টার প্ল্যানের আওতায় পর্যায়ক্রমে সকল পল্লীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রকৃত অর্থেই উন্নত পল্লী বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের আলোকে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহ নিজ নিজ কর্মএলাকা অনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে। পল্লী উন্নয়নে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় এবং মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৭.০ পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানের উপাদান ও বাস্তবায়ন কৌশল

পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে 'রূপকল্প-২০৪১' অনুসরণে দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত পল্লী গঠন। এরূপ সামগ্রিক ও টেকসই মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট পল্লীর সামগ্রিক ও সুবিন্যস্ত তথ্যের প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিশেষজ্ঞ সহায়তা (Expert Facilitation), ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান এর উপাদান ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে-

৭.১. পল্লী উন্নয়ন সেন্ট্রাল ডাটাবেজ

পল্লীর বর্তমান ব্যবস্থাপনায় সুবিন্যস্ত তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ খুবই সীমিত। পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের সর্বপ্রাথমিক প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পল্লীর সামগ্রিক ও সুবিন্যস্ত তথ্য। পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারের সকল উদ্যোগ দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন; পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলাফল ও এ সংক্রান্ত বিষয়াদি কার্যকরীভাবে মনিটরিং করা; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পল্লীর সুবিন্যস্ত ও সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও এর তথ্যবিন্যাস ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা মোটেই প্রযুক্তি নির্ভর নয়। ফলে, ডেটা বিশ্লেষণ, গবেষণা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যের ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রবাহ কোনোটিই যথাযথভবে সম্পাদন সম্ভব নয়। 'রূপকল্প-২০৪১' এর প্রেক্ষাপটে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের কর্মকৌশল নির্ধারণে ডাটাবেজ প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ 'ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল প্লাটফর্ম' এর আওতায় একটি ''পল্লী উন্নয়ন সেন্ট্রাল ডেটাবেজ (Rural Development Central Database)'' প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারে, যেখানে আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ডাটা ইনপুট ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাথমিকভাবে জরিপের মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর তথ্য, পল্লীর সম্পদ ও অবকাঠামোর তথ্য এবং জীবিকায়নের তথ্য উক্ত ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিআরডিবি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

পল্লী উন্নয়ন সেন্ট্রাল ডেটাবেজ প্রণয়নের সাথে সাথে দারিদ্র্য ম্যাপিং, ঝুঁকি ম্যাপিং, জীবিকায়ন ম্যাপিং করা ও জীবিকায়ন কোষ প্রণয়ন করার মাধ্যমে সার্বজনীন জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগ উন্নত পল্লী বিনির্মাণের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সার্বিকভাবে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিটি ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন সেন্ট্রাল ডেটাবেজ এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.২ অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়ন বলতে অবকাঠামোর উন্নয়নকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু সেই অবকাঠামো উন্নয়নেও পরিকল্পিত বা সু-সমন্বিত কোনো ব্যবস্থাপনা নেই। পল্লী অঞ্চলে সাধারণত ব্যক্তি পর্যায়ে, কমিউনিটিভিত্তিক, বেসরকারি সংস্থা বা সরকারিভাবে অবকাঠামো নির্মিত হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ভূমির শ্রেণীবিন্যাস, উপযোগিতা কোনোটিরই বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা করার প্রচলন নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র অবকাঠামো ব্যবস্থাপনাই পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট। প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানের আওতায় ইউনিয়নভিত্তিক পল্লীর অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয়, ফসলি জমির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ পরিকল্পিত পল্লী গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। এ লক্ষ্যে আমার গ্রাম-আমার শহর এবং অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

৭.৩ সার্বজনীন পল্লী জীবিকায়ন

বিশ্বায়নের ছোয়া, প্রযুক্তির স্পর্শ আজ নগরের গণ্ডি পেরিয়ে নিভৃত পল্লীতে পৌঁছে গেছে। পরিবর্তন এসেছে পল্লীর অর্থনৈতিক চিত্রে। জীবিকায়ন বৈচিত্র্যের পাশাপাশি পল্লী অর্থনীতিতেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। পল্লীতে আজ সৌদি আরবের খেজুরের চাষ হয়, চাষ হয় স্পিরুলিনা ও ড্রাগন ফলের। শহরের বিলাসদ্রব্য শতরঞ্জির উৎপাদন হয় পল্লীতে। এ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ বা উৎপাদিত সেবা ও পণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। মাস্টার প্ল্যানের আওতায় জীবিকায়ন ম্যাপিং, জীবিকায়ন কোষ প্রণয়নসহ সমন্বিত উৎপাদন-বিপণন ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, ডাটাবেজভিত্তিক ঋণ বা অনুদান সহায়তা, পণ্যের বহুমুখীকরণ, পণ্যভিত্তিক পল্লী প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি কার্যক্রম পল্লী অর্থনীতিকে যেমন গতিশীল করবে অন্যদিকে তেমনি পল্লীর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিকে টেকসইকরণে ভূমিকা পালন করবে।

৭.৪ সেবা সরবরাহের উন্নয়ন

পল্লী এলাকায় সেবা প্রদানকারী সত্তাসমূহের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য। পল্লী সেবার সিংহভাগ প্রদান করা হয়

জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের মাধ্যমে। সাধারণত দপ্তরসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উক্ত সেবা সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এ সকল সেবা প্রদান কার্যক্রমে আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। প্রস্তাবিত পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানের আওতায় একটি উপযুক্ত মডেল উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে মানসম্মত, চাহিদামাফিক ও সহজপ্রাপ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার সুযোগ রাখা হবে। একইসাথে প্রণীতব্য মডেল-এ জেন্ডার, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক বা অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসহ সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে। চাহিদামাফিক, সময়োপযোগী উন্নত সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে উন্নত পল্লী গঠনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে।

৭.৫ পল্লীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়নকে সমন্বিত ও টেকসইকরণে পল্লীবাসীর বিদ্যমান জীবনযাত্রা, প্রচলিত রীতি এবং এর উপাদানগুলোর সুষ্ঠু বিকাশে প্রয়োজন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল মানুষের জীবনযাত্রাকে একদিকে যেমন উপভোগ্য করে তোলে, অন্যদিকে তেমন সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানে সংশ্লিষ্ট পল্লীর ঐতিহ্য, ইতিহাস, চলমান ধারা কৃষ্টিকে সংরক্ষণ করে আধুনিকতার পরিশীলিত ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত পল্লীর রূপরেখা প্রণয়ন করা হলেই কেবল পল্লী উন্নয়ন টেকসই হবে।

৭.৬ পল্লী উন্নয়ন সংগঠনগুলো শক্তিশালীকরণ

পল্লী উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করতে চারটি উপাদান- মানব সম্পদ, সংগঠন, নেতৃত্ব ও নেটওয়ার্কিং বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পল্লীর সাংগঠনিক বিকাশের মাধ্যমে এ সকল উপাদানসমূহের যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে আবহমানকাল হতে জীবনের প্রয়োজনে মানুষ আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে। পল্লী উন্নয়নে এ সংগঠনসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানের আওতায় এ সকল সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণ, পল্লীসেবা প্লাটফরম হিসেবে ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা উন্নয়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তাসহ লিংকেজ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। সার্বিকভাবে পল্লী সংগঠনগুলোকে স্থানীয় কমিউনিটি উন্নয়ন ফোরাম হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

৭.৭ অংশীদারিত্বমূলক, সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রের মহান বুলির মতো করে যদি পল্লী উন্নয়নকে চিন্তা করা হয় তাহলে বলা যায়- পল্লী উন্নয়ন হচ্ছে পল্লীবাসীর, পল্লীবাসীর দ্বারা এবং পল্লীবাসীর জন্য উন্নয়ন। অর্থাৎ পল্লী উন্নয়নের সকল পরিকল্পনা অংশীদারিত্বমূলক, সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানের আওতায় এই অংশগ্রহণের সুযোগ, ব্যাপ্তি ও পদ্ধতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন- বার্ড, আরডিএ, বাপার্ড, বিআরডিটিআই কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা ও পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরূপ মডেলকে বিআরডিবিসহ পল্লী উন্নয়নে অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই ২০৪১-এ দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, আত্মনির্ভরশীল, টেকসই পল্লী সৃজন সম্ভব হবে।

৭.৮ কার্যকর সমন্বয়

পল্লীর বিভিন্ন অংশীজনের সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ বিষয়ে জাপান বাংলাদেশের যৌথ গবেষণায় উদ্ভাবিত এবং বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত লিংক মডেল একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হতে পারে। এখানে গ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সমস্যা সমাধান বা সম্ভাবনার আলোকে গ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সকল গ্রাম উন্নয়ন কমিটির প্রতিনিধি ও জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় একদিকে যেমন গ্রাম কমিটির চাহিদা বা পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়, অন্যদিকে তেমনি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ বা উন্নয়ন কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ এক্ষেত্রে মডারেটর এর দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রক্রিয়ায় বিআরডিবি সামগ্রিক বিষয়টি ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে।

৭.৯ পল্লী উন্নয়ন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই আকারে বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে সমন্বিত ফোরাম এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রাম বা ওয়ার্ড পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করতে

ঋণ কার্যক্রম ও সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক, বিআরডিবি, ঝিকরগাছা, যশোর।

পারে। ইউনিয়ন রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা, প্রতিনিধিত্বশীল ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি, সক্ষম পল্লী সংগঠন, জাতি গঠনমূলক সংস্থাসমূহের দাপ্তরিক অংশগ্রহণ, উপজেলা ও জেলা সমন্বয় কমিটি এবং পলিসি পর্যায়ে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.১০ পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিকভাবে অঞ্চলভিত্তিক পাইলট ইউনিয়নে বিআরডিবি'র সহায়তায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য অংশীজনের সমন্বয়ে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ওয়ার্ড পর্যায় হতে জরিপ, কর্মশালার মাধ্যমে সমস্যা, চাহিদা, পরিকল্পনাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পূর্বপ্রণীত প্রোফর্মা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা যেতে পারে। মাস্টার প্ল্যান উপজেলা পর্যায়ে অনুমোদিত হবে এবং বাস্তবায়নের কর্মকৌশল ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মবণ্টন নির্ধারিত হবে। সরকারি নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিআরডিবি'র আওতায় একটি প্রকল্প হিসেবে প্রাথমিকভাবে দেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে পারে।

৭.১১ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্রমধারা

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় নিভৃত গ্রাম হতে রাষ্ট্রযন্ত্র সবকিছুই ক্রমপরিবর্তনশীল। আধুনিকতা ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলার পল্লীতেও উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ধারা দৃশ্যমান। পল্লীর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক পল্লী উন্নয়ন

কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত মান নিশ্চিতকল্পে ক্রমধারাবাহিকতা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগোষ্ঠী, সম্পদ, জীবিকার সঠিক তথ্যবিন্যাস, উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন, মূলধন সৃষ্টি, সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা, সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়, ইত্যাদি উল্লেখিত ক্রমধারাবাহিকতার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ ধাপসমূহ একদিকে যেমন পৃথক পৃথকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অপরদিকে তেমনই একে অপরের পরিপূরক। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে উপজেলার সকল ইউনিয়নগুলোকে দারিদ্র্যমুক্ত, স্বাবলম্বী, সমৃদ্ধ ও উন্নত শ্রেণিতে উন্নীত করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থানরত বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পল্লী উন্নয়নে ক্রমধারার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে।

৭.১২ উন্নত পল্লী গঠন' ধারণাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপদান

উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উন্নত পল্লী গঠন ধারণাটি সকল স্তরে ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি গুরত্বের সাথে বিবেচ্য। প্রথমেই তৃণমূল পর্যায়ে 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনের পথ পরিক্রমায় উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লী সৃজনকে রাজনৈতিক এজেন্ডা এবং সরকারের কর্মকৌশল এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অতঃপর সামগ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লী গঠন ধারণার ব্যাপকভিত্তিক প্রচার আবশ্যক। সরকারি মাধ্যম, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, মিডিয়া, বেসরকারি বা এনজিও মাধ্যম ব্যবহার করে সকল অংশীজনকে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করতে হবে। এজন্য অর্থবহ, উদ্বুদ্ধকরণমূলক, মুখরোচক স্লোগান প্রচার করতে হবে। নিয়মিত সভা, সেমিনার করে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। এভাবে 'উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লী গঠন' ধারণাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার মাধ্যমেই ২০৪১ এর প্রত্যাশিত উন্নত পল্লী অর্জন সম্ভবপর হবে।

৮. পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান ধারণাটি খুব পুরাতন নয়। উন্নত পল্লী গঠনের নিমিত্ত পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন-অনুমোদন-বাস্তবায়ন-মূল্যায়ন ক্রমধারায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- সরকারি কর্মকৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা;
- পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যানের ক্ষেত্র, আওতা/পরিধি চিহ্নিত করা, মানসম্মত Base Paper প্রণয়ন;
- মাস্টার প্ল্যানের সুনির্দিষ্ট ফলাফল চিহ্নিত করা;
- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ;
- জনগণকে মাস্টার প্ল্যানের ধারণায় সম্পৃক্তকরণ;
- জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- অংশীজনের সহযোগিতা;
- বিভিন্ন মেয়াদের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিশনারি পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বিশেষজ্ঞ সহায়তা (Expert Facilitation) নিশ্চিত করা;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করা;
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতা ও সমন্বয়;
- মাস্টার প্ল্যানের আওতায় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসইকরণ;
- উন্নত পল্লী গঠনের পূর্ববর্তী ধাপসমূহ যথা- দারিদ্র্যমুক্ত, স্বাবলম্বী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল পল্লী গঠনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন।

৯.০ পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন ও বিআরডিবি

পল্লী অর্থনীতির বিকাশে বিশেষায়িত বিভাগগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু জনগণের চাহিদা বহুমুখী যা এককভাবে বিশেষায়িত কোনো বিভাগ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা সম্ভবপর হয় না। পল্লীর জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণে প্রয়োজন সমন্বয়ের। এমন কোনো সংস্থা এ সমন্বয়ের কাজটি করতে পারে যার বিচরণক্ষেত্র শুধু অবকাঠামো বা কৃষি বা মৎস্য নয়, বরং সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়নের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত এবং সরকারি পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যতম বৃহৎ সংস্থা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত। বিআরডিবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততায় পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালনে যোগ্য এবং আগ্রহী একটি প্রতিষ্ঠান।

১০.০ উপসংহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের অভিযাত্রায় বিআরডিবি ''উন্নত পল্লী-উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ'' প্রতিপাদ্য নিয়ে সামিল হয়েছে। 'রূপকল্প-২০৪১' এর প্রারম্ভে প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে বিআরডিবিকে বহুমুখী দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নের বহুমাত্রিকতা ও জনগোষ্ঠীর বহুমুখী চাহিদা বিবেচনায় সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশীদারিত্বমূলক, সমন্বিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনাই পারে উন্নত পল্লীর ধারণার সার্থক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে।

বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শনকে উপজীব্য করে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী (৬২%) যারা পল্লী অঞ্চলে বাস করে সেই দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন এবং পল্লী এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লী সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) মডেল পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। পল্লী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কার্যকর সমন্বয় ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রশাসনিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পল্লীকে দারিদ্র্যমুক্ত করে উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লীতে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে রোডম্যাপ প্রদান করা হয়েছে এ মাস্টার প্ল্যানে। পল্লীর নাগরিক সুবিধা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পল্লীকে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লীতে রূপান্তরই হতে হবে 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনের অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ। পল্লী উন্নয়নের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে বিআরডিবিকে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত আত্মনির্ভরশীল পল্লী সৃজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পল্লী এলাকা উন্নত ও সমৃদ্ধ হলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর সহজতর হবে।

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

টেকসই পল্লী উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের রোডম্যাপ

মোঃ রেজাউল আহসান

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। দেশের অধিকাংশ এলাকা পল্লী জনপদের অন্তর্ভুক্ত। দেশের মোট জনসংখ্যার ৬২% মানুষ এই পল্লীতে বাস করে। এ বৃহৎ জনপদ এবং এ বিপুল জনসমষ্টির উন্নয়ন ব্যতীত দেশের সামগ্রিক প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও জনপদের উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

সাংবিধানিক এ ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে পল্লী এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

সরকার স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের নীতি, পরিকল্পনা, প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। একই ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য অর্জনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ- তাঁর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে অর্জিত সাফল্যকে ধারণ করে চাহিদার নিরিখে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে সময়োপযোগী নতুন নতুন কৌশলের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন; পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে উৎসাহিতকরণ; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি এবং এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশিয়, আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগসূত্র স্থাপন; সময়ের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সমবায় পদ্ধতিকে যুগোপযোগীকরণ; সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পল্লীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ); ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পল্লী উন্নয়ন হলো পল্লী এলাকার ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মানের (standard of living) উন্নয়ন করা। পল্লী এলাকার উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ বহুমাত্রিক। এ কারণে পল্লী অঞ্চল এবং এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে—পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা; ক্ষুদ্র ঋণ, সমবায় সমিতি গঠন, কৃষিঋণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায় ইনসিওরেন্স, সমবায় মার্কেটিং, সমবায় চাষাবাদ, দুগ্ধ সমবায় এবং অন্যান্য সমবায় পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের আয় বৃদ্ধি করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ইত্যাদি। বিদ্যমান পরিকল্পনা ও কৌশলের আলোকে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। পল্লী এলাকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণকে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো মোকাবেলার জন্য লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের লক্ষ্য

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি টেকসই ও ত্বরান্বিত করা। এ লক্ষ্যের সাথে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলোর সমন্বয়ের জন্য ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে যে ব্যবস্থা নেয়া হবে তা হলো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পল্লী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস করা; অসমতা হ্রাস করা; কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; পল্লী জনগণের আয় বৃদ্ধি করা।

৮ম পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও কৌশল

উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে এ বিভাগের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে :

ক) পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান ও আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
খ) পল্লী এলাকায়, বিশেষ করে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য কমিয়ে আনা;
গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মূলধন গঠনের জন্য সমবায় কার্যক্রম জোরদারকরণ;
ঙ)কৃষিজাত ও অকৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য মার্কেট-লিংকেজ তৈরি।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে নিম্নোক্ত কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে :

পল্লী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন

পল্লী জনগণের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিকরণ, নেতৃত্বের উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন—বার্ড, আরডিএ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পল্লী উন্নয়ন মূলধন সেবা সম্প্রসারণ

পল্লী এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও এর কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান ও সহায়ক লিংকেজ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

পল্লী জীবিকায়ন ম্যাপিং

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে পল্লী এলাকার ঐতিহ্যবাহী প্রধান প্রধান পেশার তথ্য সংগ্রহ করে পল্লী জীবিকায়ন ডেটাবেইজ ও ম্যাপ তৈরি করা হবে এবং "জীবিকায়ন কোষ" প্রণয়ন করা হবে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে

নির্মাণাধীন পল্লী জনপদ, রংপুর

সফলভাবে এ কাজ সম্পাদন করতে পারে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ এ ডেটাবেইজ ও ম্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন।

পল্লী এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় 'পল্লী পণ্য মেলা' এর আয়োজন করা হবে। এ সমস্ত দ্রব্যের ব্র্যান্ডিং ও প্রমোশনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এ ধরনের কাজ করে আসছে। সুতরাং সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় বিআরডিবি'র মাধ্যমে 'পল্লী পণ্যের ই-কমার্স' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

লাইভলিহুড ভিলেজ প্রতিষ্ঠাকরণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় 'লাইভলিহুড ভিলেজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পেও এ ধরনের ভিলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সুতরাং বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ-ঋণ-উৎপাদন-বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় 'লাইভলিহুড ভিলেজ' যেমন : Duck Village, Carpentry Village, Embroidery Village, Tailoring Village ইত্যাদি) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কেন্দ্রীয় পল্লী উন্নয়ন ডেটাবেইজ

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারের সকল উদ্যোগ দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন; পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসকরণ : উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান হচ্ছে কি না, আয় বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, দারিদ্র্য হ্রাস হচ্ছে কি না—এ সমস্ত বিষয়াদি কার্যকরীভাবে মনিটরিং করা; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে একটি 'কেন্দ্রীয় পল্লী উন্নয়ন ডেটাবেইজ' গড়ে তোলা হবে।

পল্লী এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন

যোগাযোগ এবং বিভিন্ন অনলাইন সেবা গ্রহণ পল্লী এলাকার জনগণের জন্য সহজতর করার উদ্দেশ্যে গ্রাম পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক আইটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

পল্লী উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন

৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে গ্রামীণ দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়নে এবং তাদেরকে গ্রামীণ উন্নয়নের মূলধারায় আনার জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা, বাজারজাতকরণ লিংকেজ প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। পল্লী এলাকায় যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে, নারীদের উদ্যক্তকরণ প্রতিরোধে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে।

পল্লী এলাকায় ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

কৃষিজাত পণ্য পচনশীল দ্রব্য। পল্লী এলাকায় পর্যাপ্ত ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে ফসল সংগ্রহ মৌসুমে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসল নিম্ন মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে, অন্য মৌসুমে একই উৎপাদিত দ্রব্যের দাম অনেক বেশি থাকে। কখনো কখনো অমৌসুমে বিদেশ থেকে এ সমস্ত পণ্য আমদানি করতে হয়। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় এবং এ সমস্ত দ্রব্য ক্রেতাদেরকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়। এতে কৃষক ও ক্রেতা উভয়ের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য পল্লী এলাকায় স্বল্পমেয়াদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যাচাই করা হবে।

পল্লী এলাকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিস্তৃতকরণ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ পল্লী এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি

হ্রাসে আয়বর্ধনমূলক কার্যাবলি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, মূলধন সরবরাহ, মূলধন গঠন, খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে এ সকল কর্মসূচি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ভূমির অঞ্চল বিভাজন

পল্লী এলাকার মানুষের প্রধান পেশা হলো কৃষি, আর ভূমি বা মৃত্তিকা হলো কৃষিকাজের অন্যতম মৌলিক উপাদান। মৃত্তিকার স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভূমির অঞ্চল বিভাজন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক। একটি ইউনিয়ন পরিষদের অধিভুক্ত এলাকায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরির জন্য স্থানীয় জনগণ, বিআরডিবি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে যৌথ উদ্যোগ নেয়া হবে।

পল্লী আবাসন

আবাসন মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলেও পল্লী এলাকায় আবাসন সুবিধা অপ্রতুল। গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে স্বল্প খরচে আবাসন সুবিধা দেয়ার জন্য ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিআরডিবি'র মাধ্যমে একটি আবাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয় বিবেচনা করছে।

পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা সদরের সাথে গ্রোথ-সেন্টারের সংযোগ সড়কসমূহ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পল্লী এলাকায় অন্যান্য ক্ষুদ্র অবকাঠামো যেমন—ছোট ছোট গ্রামীণ রাস্তা, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ বা অন্য কোনো সংস্থার কর্মসূচিতে নেই। বিআরডিবি ২০০০ খ্রি. থেকে অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন পদ্ধতি এর মাধ্যমে পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ স্কীম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০৪১ সালের মধ্যে সুসম পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী এ কার্যক্রম বিস্তৃত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিআরডিবি'র মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ

গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পল্লী এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য এ ধরনের শিল্পকে স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নির্দেশনায় বিআরডিবি কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে মূলধন, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, কাঁচামাল ইত্যাদি সহায়তা দিচ্ছে। ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে আরও কিছু উদ্যোগ নেয়া হবে।

পল্লী উন্নয়নে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

কৃষিকে লাভজনক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো কৃষি যান্ত্রিকীকরণ। কৃষিতে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত পশু সংখ্যা কমে যাওয়ার সাথে সাথে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের জন্য জমি তৈরি থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতি ধাপে সময় কমিয়ে আনা আবশ্যক। প্রচলিত কৃষি পদ্ধতিতে প্রতি ধাপে বেশি সময় ও খরচের প্রয়োজন হয়। তাই কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পল্লী এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফল মোকাবেলা করার লক্ষ্যে প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা বজায় রাখা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন এবং মৃত্তিকা, পানি ও বাতাস দূষণ প্রতিরোধকল্পে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা হবে। পল্লী এলাকায় অংশগ্রহণমূলক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হবে।

পল্লী অর্থনীতির বহুমুখীকরণ

কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের পাশাপাশি পল্লীর জনগণের আয়ের উৎস ও পেশার বৈচিত্র্যকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অকৃষিখাতের উন্নয়ন জোরদার করা হবে।

সুসম পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পল্লী উন্নয়নের অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পশ্চাৎপদ এলাকার কৃষি, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অকৃষিখাতে উদ্যোগ বৃদ্ধি, ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধিসহ উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে।

পল্লী এলাকায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন জোরদারকরণ

পল্লী অঞ্চলে বয়স্ক জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধির জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে এবং পল্লী সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও বিভিন্ন পল্লী সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন

পল্লী এলাকায় অ্যাকশন রিসার্স ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা; লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ ও বাপার্ড এর কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে। টেকসই পল্লী উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহ, বিআরডিবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য দেশিয় ও বৈদেশিক উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম জোরদারকরণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও সমবায় অধিদপ্তর থেকে সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হবে, উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য সহায়তা দেয়া হবে। জনগণের মধ্যে ভ্যালুচেইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনে সহায়তা প্রদান, বাজারজাতকরণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ভ্যালুচেইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সমবায়ভিত্তিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে প্রশংসনীয় স্থান দখল করে আছে। স্বাধীনতার পরপর সত্তরের দশকে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০%, বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে এ হার ছিল ২০%। সুতরাং করোনাজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলে বাংলাদেশ আগামী ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে স্থান করে নিতে পারবে মর্মে আমাদের বিশ্বাস।

মোঃ রেজাউল আহসান, সরকারের সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ভাবনা

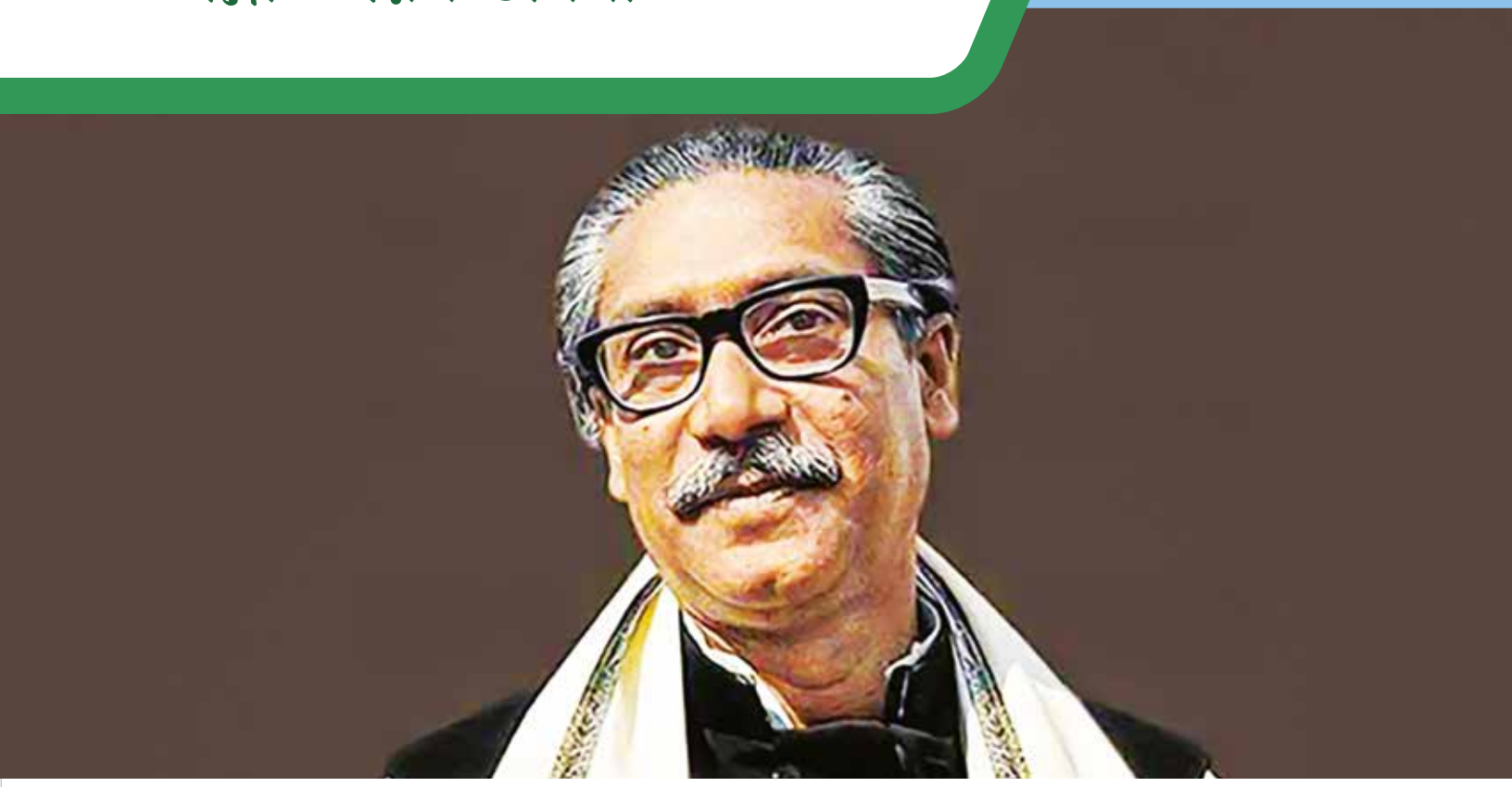

ড. আতিউর রহমান

ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খল ছিড়ে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা আর উন্নত জীবন নিশ্চিত করাই ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্র। এ চিন্তাই তাঁর সমগ্র কর্মকাণ্ডকে চালিত করেছে আজীবন। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হলেও দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষ ছিল নির্যাতিত, অবহেলিত। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন দেশকে স্বনির্ভর করতে সবার আগে প্রয়োজন কৃষকদের মুক্তি আর গ্রামাঞ্চলের জন্য উন্নয়নের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা।

প্রকাশিত গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলোতে দেখা যায় পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারবার পূর্ববাংলার খাদ্য-সংকট নিয়ে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ মে শেখ মুজিব নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় প্রশ্ন তোলেন- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামবাসী তীব্র খাদ্য ও বস্ত্র

সংকট এবং অবিচারের শিকার কেন হচ্ছেন? তিনি আরও বলেন বরিশাল একটি ধান-উদ্বৃত্ত জেলা। অথচ সেখানেও চাল বিক্রি হচ্ছিল ৪০ টাকা মন দরে। মুসলিম লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টি হলে খাদ্য সংকট থাকবে না, মানুষ বস্ত্র ও বিচার পাবে। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতির কোনো বাস্তবায়ন না দেখে মানুষ খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯)। পূর্ববাংলার গ্রামীণ মানুষের এই বঞ্চনার কথা দিনদিন আরও জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর মুখ থেকে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছিল পূর্ববাংলার বঞ্চিত গ্রামীণ মানুষের ভোটেই।

মাত্র কয়েকদিনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (১৪ মে - ৩০ জুন ১৯৫৪)। এই স্বল্পসময়েই তিনি সমবায় দপ্তরের জন্য আলাদা বরাদ্দসহ কৃষকানুকূল বেশ কিছু নীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৫-'৫৬ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের সভায় পূর্ববাংলার কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের কল্যাণে একাধিক বক্তৃতা করেন। বিশেষ করে জমিদারদের গরিব কৃষক শোষণ ও জমিদারের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টনের মতো অসংখ্য গণমুখী প্রস্তাব গণপরিষদে উপস্থাপন করেন। ১৯৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রীদের কটাক্ষ করে বলেন, "আপনারা যদি অর্থ উপার্জন করতে চান, তাহলে বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু যখন জনসেবার কথা বলে জনপ্রতিনিধি হয়ে আসবেন তখন গরিব মেরে, ধনী হতে পারবেন না। গরিবরা ট্যাক্স দেয় এটা তাদেরই অর্থ। তাদের অর্থ ভোগ করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই।" ঐ ভাষণেই তিনি আরও বলেন যে জমিদাররা ভূমিহীন কৃষকদের অর্থেই তাদের বিলাসী জীবনযাপন করেন। অথচ এরাই সারাদিন পরিশ্রম করেও খাবার জোটাতে পারে না। তাঁর ভাষায়, "... আমরা পাকিস্তান এনেছি ধনীদের জন্য নয়, বরং দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য।" এই কৃষকবান্ধব ও পল্লীমুখী ভাবনাকে তিনি পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের প্রতিটি কর্মী-নেতার মনেই শুধু গেঁথে দিয়েছেন তাই নয়, পুরো সমাজকে এই ধারায় সচেষ্ট করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে মূলত কৃষক-সন্তানরাই ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করেন।

বহু আগে থেকেই যে বঙ্গবন্ধু কৃষকদের কল্যাণ নিয়ে ভাবতেন তা বোঝা যায় তাঁর 'আমার দেখা নয়া চীন' বইটি পড়লে। পঞ্চাশের দশকে চীন সফরে গিয়ে সে দেশের সরকারের নানা কৃষকবান্ধব নীতি তাঁকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছে। চীনা সরকারের 'লাঙল যার জমি তার' নীতির ফলশ্রুতিতে মেহনতি কৃষকের পরিশ্রমের ফল জমিদারদের পক্ষে আর আত্মসাৎ করা সম্ভব ছিল না। আর তাই কৃষকরা সোৎসাহে চাষাবাদ করছিল। এ কারণেই যে চীনের কৃষিতে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল তা অনুধাবন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক ও দুঃখী মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন কীভাবে করবেন তার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। স্বাধীন দেশে তাঁর সেসব সৃজনশীল ভাবনাকে কাজে লাগাতে কাজ করছিলেন নিরলসভাবে। সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষা কমিশন ও সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের কৌশল থেকেই তাঁর এই কর্মপরিকল্পনা আঁচ করা যায়।

যে কৃষক সন্তানেরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত ঝরিয়েছিলেন তাদের চাওয়া পাওয়ার আলোকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু সংবিধানে কৃষকসহ সাধারণ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনসহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেন। নগর ও গ্রামের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূর করার জন্য কৃষি বিপ্লব, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, কুটির ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সংবিধানে অঙ্গীকার করা হয়। তাই রাষ্ট্রের মালিকানার নীতি বিষয়ে সংবিধানে সমবায়কে রাষ্ট্রীয় মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্থান দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কারণ, এদেশের অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক যদি সমবায়ের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকে তাহলে তার আসলে কিছুই থাকে না। তাহলে ভূমিহীন কৃষক নিছক দিনমজুরে পরিণত হন। বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা চলছে। তাতে কিছু লোকের ভাগ্যের সামান্য উন্নতি হয় বটে, কিন্তু, বঙ্গবন্ধুর সময়বায়প্রকল্প ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এক বিশাল আয়োজন। সংবিধানের ১৪ নং ধারায় স্পষ্ট করেই এ কথাটি বলা আছে- "কৃষক, শ্রমিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে"।

স্বাধীনতার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু জানতেন এ দেশের জমিগুলো বেশিরভাগই জোতদারদের হাতে। অনেক জমি অনাবাদি পড়ে থাকে, কিছু জমি পতিত। আর কিছু জমি দেশভাগের পর থেকেই 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে গণ্য। ভূমির সুসম বণ্টনের জন্য ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে ভূমিস্বত্ব আদেশ জারি করেন। তাতে পরিবারপিছু সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের তিনি খাজনা মওকুফ করে দেন। কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বাস করতেন "কৃষির উন্নতি কৃষকের একার কাজ নয়। তার সাথে বিদ্বান ও বিজ্ঞানীকে মিলতে হবে।" তাই কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়তে নীতি ও অর্থ সমর্থন দেন। কৃষি স্নাতকদের সরকারি চাকরিতে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দেন। এসবই করেছেন কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষকরাই সবচেয়ে নির্যাতিত। তাই তাদের জন্য কিছু একটা করার উদ্যোগ নেবার পক্ষে ছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষকের নিজস্ব জমির ব্যবস্থা, কৃষকের মাঝে খাসজমি বিতরণ, কৃষির উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ভর্তুকি কৃষককে সার ও কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য দেওয়া, পচনশীল ফসল সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষককে প্রশিক্ষণদান। এসবকিছুরই সূচনা করে গেছেন তিনি। সদ্য স্বাধীন দেশের ৩০ লাখ টন খাদ্যঘাটতি পূরণে তাৎক্ষণিক আমদানি এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি শাসনকালের ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি ও তাদের সব ঋণ সুদসহ মাফ করে দেন।

কৃষিখাতের উন্নয়নকে বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এ কারণে যে, এক দিকে কৃষি এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের জোগান দিবে। অন্যদিকে কৃষি থেকেই আসবে বর্ধিষ্ণু শিল্প খাতের কাঁচামাল। বৃহৎ শিল্পগুলোকে তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন। কারণ এটাই ছিল তখন একমাত্র পথ। কারণ ঐ সময়টায় দেশে উদ্যোক্তা নেতৃত্বের শূন্যতা বিরাজ করছিল। পাশাপাশি তাঁর সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যও শিল্প খাত রাষ্ট্রায়ত্ত করাটা জরুরি ছিল। শিল্পায়নই সম্ভবত তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছিল। তাই 'স্টেইট-লেড গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর'ই ঐ বাস্তবতায় সবচেয়ে কার্যকর কৌশল ছিল।

স্বনির্ভর একটি দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়েই বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই ছিল তাঁর অর্থনৈতিক নীতির পয়লা নম্বর অগ্রাধিকার। সে সময় খাদ্যের জন্য অন্য

দেশের ওপর নির্ভরশীলতা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ঐ পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল ভূমিসংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে। বঙ্গবন্ধু জানতেন কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ। নানা কারণে বঙ্গবন্ধুর ভূমিসংস্কার বাঁধার সম্মুখীন হয়। যাদের ১০০ বিঘার বেশি ছিল তারা বঙ্গবন্ধুর ভূমিসংস্কারের বিরোধিতা করেন। বিবাহিত পুত্রদের আলাদা বাড়িঘর গণ্য না করাকে তারা অযৌক্তিক মনে করেন। ভূমিসংস্কার বঙ্গবন্ধু যখন করতে পারলেন না তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই যেতে হলো সমবায় আন্দোলনে। তাই ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ তিনি দিলেন দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। দ্বিতীয় বিপ্লব মূলত বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ গঠন করার প্রচেষ্টা। সমবায়ভিত্তিক সমাজগঠনের অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায়-ভাবনা থেকে এবং ১৯৫২ সালে নয়াচীন ভ্রমণ করতে গিয়ে। যদিও বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন ছিল এ দেশ ও জনপদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রেখে একান্তই তাঁর নিজস্ব মৌলিক ভাবনা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি মূলত ঘুণে ধরা সমাজকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন।

আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে তিনি তাঁর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষাকে বাস্তবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনের যে সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তবে আশার কথা যে, অনেক চড়াই-উতরাই পার করে বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশের কৃষিখাত এবং গ্রামাঞ্চলকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আলোকে আরও আধুনিক, উৎপাদনশীল ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলেছেন। কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করতে তাঁর নেয়া উদ্যোগগুলোর সুফল ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। আসলেই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ খুবই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। শহর ও গ্রামের পার্থক্য দিনদিন ঘুচে যাচ্ছে। কোটিখানেক প্রবাসী কর্মী গ্রাম থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। তারা শুধু অর্থই পাঠান না। বিদেশ থেকে আধুনিক জীবন চলা ও প্রযুক্তির বার্তাও তাদের পরিবারে বয়ে আনেন। ফলে গ্রামীণ জীবন ও জীবিকার ধরন দ্রুতই পাল্টে যাচ্ছে। একইভাবে প্রায় কোটিখানেক গ্রামীণ তরুণ-তরুণি এখন গার্মেন্টস ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানায় কাজ করছেন। তারাও অর্থ পাঠানোর পাশাপাশি শহরের জীবন চলার নানা দিক গ্রামীণ জীবনে যুক্ত করছেন। ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সংযুক্তি দ্রুতই বাড়ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশে'র উন্নয়ন অভিযান এই সংযুক্তির ধারাকে আরও বেগবান করে চলেছে। গ্রামীণ মানুষের আয়-রোজগারও তাই বাড়ছে। করোনার এই সংকটকালেও বিপর্যস্ত অনেক মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের সক্ষমতা আগের চেয়ে ঢের বেড়েছে। কল্পনা করা যায় না পঞ্চাশ বছরে গ্রাম বাংলার কি বিস্ময়কর পরিবর্তনই না ঘটে গেছে। অথচ কি বিপর্যস্তই না ছিল স্বাধীনতার ঊষালগ্নে গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারা। গতিময় কৃষি এক্ষেত্রে চালকের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১৯৯০ পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র ফিরে এলে অর্থনীতি ধীরে ধীরে গতি পেতে শুরু করে। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের অভিযাত্রায় এক নবজাগরণ ঘটলেও ২০০১ সালে আবারও তা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে দ্বিতীয় দফায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শাসনভার কাঁধে তুলে নেয়ার পর গত এক দশকে তো গ্রাম বাংলার চিত্র একেবারেই বদলে গেছে। দারিদ্র্যের হার আগের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনা গিয়েছে (২০ শতাংশের আশেপাশে), কৃষি উৎপাদন বহু গুণে বেড়েছে, কৃষি শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে পাঁচ থেকে দশ গুণ, বিদ্যুৎ সংযোগ, মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ জীবন মান বেড়েছে ঈর্ষণীয় মাত্রায়। সর্বোপরি কৃষির বাইরে অকৃষিখাতে গ্রামাঞ্চলেও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ আয়ের বড় অংশটিই এখন আসছে অকৃষিখাত থেকে। দেশের গ্রামাঞ্চল এক দিকে বর্ধিষ্ণু শিল্প ও সেবা খাতের কাঁচা মাল ও মূল্য সংযোজিত পণ্য/সেবা সরবরাহ করছে; অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে নতুন ভোক্তা হিসেবে তারা অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতেও রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতরে এই মাত্রার স্বনির্ভরতা রয়েছে বলেই এই কোভিড মহামারি কালেও বাংলাদেশের অর্থনীতি তুলনামূলক ভালো করছে। অবশ্য, কোভিড মহামারি অতিদারিদ্র্য ও দারিদ্র্য উভয় ক্ষেত্রেই বড় রকমের আঘাত হেনেছে। তবে গ্রামের চেয়ে শহরেই এই আঘাত বেশি করে লেগেছে। কেননা, শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বড় অংশই জীবিকার জন্য অনানুষ্ঠানিক খাতের ওপর নির্ভরশীল। আর মহামারির আঘাতটা সেখানেই বেশি করে পড়েছে।

নাটোরের ধানক্ষেতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনৈক কৃষকের সাথে কথা বলছেন। ছবি : বঙ্গবন্ধু অনলাইন আর্কাইভ

তবে এ কথা মানতেই হবে যে, গত এক দশকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে তা সত্যিই অতুলনীয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি ও সেগুলোর বেশিরভাগের সুদক্ষ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো গ্রাম এখন নগরের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। একই সঙ্গে মানুষের নিজেদের উদ্যোগ, সামাজিক পুঁজির প্রয়োগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। ব্যক্তি খাতও কিন্তু পিছিয়ে নেই। গ্রামেও এখন

১৯৭৪ সালের লবণ সংকট! লবন চাষ উৎসাহিত করতে কক্সবাজারে লবন চাষীদের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সেবা খাতের তৎপরতা প্রায় সমান দৃশ্যমান। চায়ের দোকান, কফি শপ, রেস্তোরাঁ, সেলুন, বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, কোচিং সেন্টার, হেলথ ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, সাইবার ক্যাফের উপস্থিতি এখন গ্রামাঞ্চলেও খুব স্বাভাবিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে ঠিকই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অকৃষি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তা সামাল দেয়া গেছে ভালোভাবেই। পরিসংখ্যান বলছে এখন গ্রামীণ আয়ের ষাট শতাংশ আসে অকৃষিখাত থেকে। তরুণ শিক্ষিত উদ্যোক্তারা বিশেষ করে ডিজিটাল উদ্যোক্তারা এই খাতে এখন বেশি বেশি যুক্ত হচ্ছেন। অকৃষিখাতের এই উন্নতির পেছনে কৃষিখাতের ভূমিকাও কম নয়। উপকরণ সরবরাহ ও চাহিদা বৃদ্ধির দিক দিয়ে অকৃষিখাতকে চাঙা রাখছে কৃষি। বস্তুত আমরা দুপায়েই হাঁটছি।

মনে রাখা চাই যে, এখনও মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ কৃষিখাতেই নিযুক্ত আছে। সরকারও তাই কৃষির দিকে নীতি মনোযোগ অব্যাহত রেখেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বাজেটে কৃষিখাতে বাড়তি বরাদ্দ দিয়েছেন। বস্তুত তিনি কৃষিতে ভর্তুকি নয়, বিনিয়োগ বাড়িয়েছেন। বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়নে। কৃষি গবেষণায় বেশি বেশি নীতি সমর্থন থাকায় নতুন নতুন জাতের ধান, গম, ভুট্টা ও সব্জির উৎপাদন বেড়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ১৩টি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া ২০১৩ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিংক-সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। এর বাইরে পাটের কয়েকটি নতুন জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি পাটের জীবন রহস্যও উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কৃষিতে এমন বিপ্লবের ফল হিসেবেই ১৯৭২-এর তুলনায় আজ আমাদের উৎপাদন ২৫ গুণেরও বেশি। আমাদের কৃষকরা ৮০-৯০ শতাংশ প্রযুক্তিনির্ভর। খাদ্য উৎপাদনের সূচকে আমরা পেছনে ফেলেছি ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম এবং এমনকি চীনকেও।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জীবন মানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে কৃষির আধুনিকায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অকৃষিখাতের বিস্তার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং সর্বোপরি প্রবাসী আয় বৃদ্ধি। তবে এসবগুলো শক্তিকে এক সূত্রে গাঁথতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে সরকারের যথাযথ সহায়তায় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান। এক দশক আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান শুরু হয়েছিল তার পেছনে মূল ভাবনাটিই ছিল সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণের কাছে সহজে উপযোগি আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া। উদ্ভাবনী আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নীতির কল্যাণে সর্বশেষ বৈশ্বিক মন্দার মুখেও সামষ্টিক অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছিল বাংলাদেশ। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, চলমান করোনাজনিত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযানের ঐ ধারাবাহিকতা ধরে রেখে উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল আর্থিক সেবার টেকসই প্রসার নিশ্চিত করতে হবে। আর এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে 'অর্থনীতির রক্ষাকবচ' কৃষি ও এসএমই খাতকে।

বঙ্গবন্ধুর পল্লী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন দর্শনের আলোকে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন তাঁর কন্যা। শত প্রতিকূলতার মুখে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিকে তিনি যথার্থভাবেই লালন করতে পেরেছেন। পদ্মা সেতুর সর্বশেষ স্প্যানটি স্থাপনের মাধ্যমে বাঙালির লড়াকু চরিত্র তিনি নতুন করে বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেক চড়াই-উৎরাই সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার পথে। চলমান করোনা সংকটকালেও বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দেশের চেয়ে ভালো করছে। তবে চ্যালেঞ্জ তো আছেই। অদৃশ্য ভাইরাসকে মোকাবেলা করেই সামনের দিকে হাঁটছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর প্রোথিত লড়াকু মন নিয়েই তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে সমৃদ্ধির পথে। উন্নয়নের এই অভিযাত্রা সচল থাকুক।

ড. আতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

গ্রামীণ রূপান্তরের আলেখ্য

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশের গ্রামীণ রূপান্তরে একটি ধারাবাহিকতা আছে যেখানে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি উদ্যোগ দুটোরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পঞ্চাশ-ষাট দশকে কুমিল্লা মডেল খ্যাত ড. আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত বহুমাত্রিক গ্রামীণ রূপান্তর কর্মসূচি এই পরিবর্তনের সূচনালগ্নে নিয়ামক ভূমিকায় ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে কুমিল্লা মডেলের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরসূরি প্রতিষ্ঠান—বিআরডিবি ও এলজিইডি। বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষির আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখে। এলজিইডি গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। সংস্থাটি গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছে। মূলত এলজিইডির ফিডার রোডগুলোর সূত্র ধরেই গ্রামগুলো শহর ও বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হলো। এর আগে ৬৮ হাজার গ্রাম স্বনির্ভর ছিল, একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগ ছিল না। ফিডার রোড হওয়ার প্রেক্ষাপটে আশি-নব্বই দশকের পরে মূলত বড় ধরনের গ্রামীণ রূপান্তর ঘটেছে।

গ্রাম-শহর একটা কন্টিনিউয়াম হয়ে গেছে। জাতীয় অর্থনীতির একটা ভিন্নতর বাস্তবতা তৈরি হলো। গ্রামও জাতীয় বাজারে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার হিসেবে সামনে এলো। এর ফলে কৃষক তার পণ্য বিক্রির সুযোগ পেল। বিআরডিবির কৃষি আধুনিকায়নের ভূমিকাও এখানে কৃষককে জাতীয় অর্থনীতিতে বৃহত্তর অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলো।

দ্বিতীয় একটি পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় আশির দশকে। গ্রামীণ ব্যাংক ও তার পথ ধরে ক্ষুদ্র ঋণের অর্থায়ন। গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে থাকা নারীদের ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি গ্রামের অকৃষিখাতের বিকাশে সহায়তা করেছে। নারীরা যুক্ত হওয়ার পর গ্রামীণ অকৃষিখাত চাঙা হলো। এখানে ক্ষুদ্র ঋণ একটা চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আর্থিক সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত করলো। ঋণের অর্থ ব্যবহার করে নারীরা নানা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছে। এতে নারীরা নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হয়েছে, তেমনি পরিবারের আয়ও বেড়েছে; যা গ্রামীণ এলাকায় আর্থ-সামাজিক রূপান্তরে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

গ্রামীণ রূপান্তরে এনজিওদের ভূমিকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এক্ষেত্রে মূলত ফজলে হাসান আবেদের কথাই প্রথমে আসে। তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যে একটা ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি প্রজননক্ষম নারীর বোঝাটা কমানোর একটা বাস্তবতা তৈরি করতে সহায়তা করলেন পরিবার পরিকল্পনার ওপর জোর দিয়ে এবং এ সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেয়ার মাধ্যমে। আগে নারীপ্রতি সন্তান জন্মদানের হার অনেক বেশি ছিল। প্রতিটি ঘরে সন্তান ছয়-সাতজনের কম ছিল না। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সন্তান জন্মদান হার দুয়ের মধ্যে সীমিত হলো। ফলে নারীদের ওপর প্রজননের দায়িত্ব অনেকখানিই কমে এলো এবং তাদেরও ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বাড়ল। এর প্রভাব অবশ্য সুদূরপ্রসারী। বলা চলে, খণ্ডিত অর্জন হলেও স্বাস্থ্যের কিছু সূচক গ্রামীণ রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশেষ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্য এলো। শিশু মৃত্যুহার অবশ্য দুইভাবে হ্রাস পেল। টিকাদান কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং ডায়রিয়া প্রতিরোধী কার্যক্রম। উভয় ক্ষেত্রেই এনজিওরা বড় অবদান রেখেছে।

গ্রামীণ রূপান্তরে শিক্ষা সম্প্রসারণের বিষয়টি একটি বড় প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে মূল কাজটি অবশ্য করেছে সরকার। বিশেষ করে নব্বই দশকে প্রাথমিকে বৃত্তি প্রকল্প এবং পরবর্তীতে মাধ্যমিকে বৃত্তি প্রকল্প শিক্ষা বিস্তারে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। এনজিওরা এক্ষেত্রে সচেতনতা কার্যক্রম জোরদারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। শিশু স্বাস্থ্য ও শিশু শিক্ষায় সচেতনতার কাজটি করেছে এনজিওরা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেবা নিশ্চিতেও এনজিওরা কিছুটা ভূমিকা রেখেছে, তবে এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা মূলত সরকারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বৃত্তি প্রকল্পের।

গ্রামীণ রূপান্তরে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কৃষি বিজ্ঞানীদের। তারা শস্যের নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন করেছে। এটা গ্রামীণ এলাকায় কৃষির অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গ্রামীণ রূপান্তরে আরেকটি ফ্যাক্টর হলো বৈদেশিক শ্রমবাজারে আমাদের দেশের মানুষের অভিগমন। এক্ষেত্রে গ্রামের মানুষরাই মূলত বাইরে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তারা বিভিন্ন দেশে যাওয়ার সুযোগ পেল। তাদের বাইরে যাওয়াটা এবং রেমিটেন্স পাঠানোর মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে একটা ভূমিকা রেখেছে, আবার গ্রামীণ অকৃষিখাতের বিকাশেও একটা সমর্থনমূলক ভূমিকা রেখেছে। সব মিলিয়ে গ্রামীণ রূপান্তর ত্বরান্বিত হয়েছে।

গ্রামীণ রূপান্তরে নীতি সহায়তাও বড় ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে আশির দশকের শেষে নব্বই দশকের প্রথম দিকে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এক ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়। যার ফলে বিদেশ যাওয়া সহজ হলো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সহজ হলো, এমনকি ব্যাংকিং খাতেরও বিকাশ ঘটে। নীতি সহায়তার একটা দিক ছিল নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতি থেকে কিছুটা সরে আসা। দুই. নিরাপত্তা জাল কর্মসূচিগুলোর ধাপে ধাপে বিকাশ ঘটানো। হয়তো অর্থের পরিমাণ খুব বেশি নয়, কিন্তু সেটি দরিদ্র মানুষের ঝুঁকিটা কমাতে সহায়তা করেছে। মানুষ ধসে পড়েনি, একটা নিরাপত্তা জাল পেয়ে টিকে থাকতে পেরেছে। কাজেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোও একটা ভূমিকা রেখেছে। মোটাদাগে বলতে গেলে গ্রামীণ রূপান্তরে উল্লিখিত ফ্যাক্টরগুলো বড় মাত্রায় কাজ করেছে।

তবে সাম্প্রতিক প্রবণতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গ্রামীণ রূপান্তরের বিষয়টি এখন পেছনে পড়ে গেছে। আশি, নব্বই, এমনকি গত দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গ্রামীণ বিকাশ সবচেয়ে মনোযোগের বিষয় ছিল। এখন এটি বড় আকারে কৌশলগত ফোকাসে নেই। আমলাতান্ত্রিক উদারীকরণের একটা বাস্তবতা থেকে নব্বই দশকে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত পরিবেশ ছিল। এখন আবার আমরা এক ধরনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো গ্রাম প্রান্তিক অবস্থায় পড়ে গেছে। খাদ্যনিরাপত্তার জন্য গ্রাম দরকার, শহরের মানুষকে অন্তত খাওয়াতে হবে। গ্রামকেন্দ্রিক কৃষির অতটুকু স্বীকৃতি রয়েছে। এর বাইরে গ্রামের গুরুত্ব নীতি-চিন্তায় খুব একটা নেই বলেই প্রতীয়মান।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্য বিষয়গুলো মিলে সামগ্রিকভাবে গ্রামের সম্ভাবনাগুলো তৈরি হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিকাশের জন্য যে সমর্থনমূলক নীতি পরিবেশ, সেটি অনুপস্থিত। কারণ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে সুযোগ-সুবিধা, নীতি মনোযোগ সবক্ষেত্রেই মূলত ম্যাক্রো-ইকোনমিক অ্যাক্টরগুলোই প্রাধান্য পাচ্ছে। নতুন পরিবর্তনের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামীণ রূপান্তর একটা স্থবিরতার মধ্যে পড়ে গেছে। কিন্তু কোভিড ১৯ গ্রামীণ রূপান্তরের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তায় আবারো একটা বড় ধাক্কা দিয়েছে কিংবা এর ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এটাকে কাজে লাগাতে হলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মডেলটাকে পরিবর্তন করতে হবে। স্থানীয় সরকারগুলোকে আরও অর্থবহভাবে শক্তিশালী করতে হবে। তহবিল প্রবাহ গ্রামের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এখন আসলে বড় বড় শহরগুলোয় গ্রাম থেকে অর্থ প্রবাহ আসছে। রেমিট্যান্স হয়তো যাচ্ছে গ্রামে। কিন্তু সরকারি প্রকল্পগুলোর সুফল সেখানে মিলছে না। একটি চিত্র কল্পনা যাক : ধরেন কোনো এক জেলায় হয়তো এলজিইডির এক হাজার কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। ঐ এক হাজার কোটি টাকার লাভটা (ধরা যাক- ৫০০ কোটি টাকা) আসলে কোথায় যাচ্ছে? ঐ কাজের যারা ঠিকাদারি পেয়েছেন তারা ঐ জেলায় থাকেন না, ঢাকায় থাকেন। ঢাকায়ও হয়তো থাকেন না। দুবাই কিংবা মালয়েশিয়ায় থাকেন। ঐ অর্থ ওখানেই চলে যাচ্ছে। ফলে উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম ঠিকই বঞ্চিত হচ্ছে। এর পরিবর্তন জরুরি।

পুরো বিষয়টিকে সারসংক্ষেপ করে বলা যায়, বিভিন্ন ফ্যাক্টরের কারণে আশি, নব্বই এবং চলতি শতকের শূন্য দশকে গ্রামীণ রূপান্তরের একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপরে আমরা এক ধরনের গ্রামীণ স্থবিরতার মধ্যে প্রবেশ করেছি। এখন কোভিড গ্রামীণ রূপান্তরের একটা প্রেক্ষিত তৈরি করেছে। এটি বিবেচনা নিয়েই

শতরঞ্জি তৈরি প্রশিক্ষণ, উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি, বিআরডিবি, রংপুর।

আগামী দিনে অন্যতম এজেন্ডা হওয়া উচিত গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণ। কোভিড ১৯ মহামারির অভিঘাতে শহর থেকে অনেকেই গ্রামে চলে গেছে। তাদের কর্মসংস্থান এখন দরকার। খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টিনিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি দেখা দিয়েছে। রপ্তানি খাতনির্ভর যেসব প্রবৃদ্ধি চালক ছিল সেগুলো বৈশ্বিক অর্থনীতি ধাক্কা খাওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ওপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তাটা বেড়ে গেছে। এটা বেড়ে যাওয়া মানে গ্রামীণ অর্থনীতির একটা ভূমিকা প্রয়োজন হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি বলতে কৃষি এবং অকৃষি দুটোকে মিলিয়েই দেখতে হবে। গ্রাম এবং মফস্বল শহর দুটোকে মিলিয়েই গ্রামীণ রূপান্তর চিন্তা করতে হবে।

দেশের উন্নয়ন চিন্তায় মেট্রোপলিটন প্লাস গ্রোথ করিডর বনাম গ্রামীণ একটা বিভাজন আছে। এখন নীতি প্রাধান্য, সুযোগ প্রাধান্য, বাজেট প্রাধান্য সবই পাচ্ছে কিন্তু মেট্রোপলিটন প্লাস গ্রোথ করিডর। আর গ্রামীণের মধ্যেই একেবারে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অবস্থান। কাজেই সার্বিকভাবে গ্রামীণকে প্রাধান্য দেয়ার সময় এসেছে।

সরকার আমার গ্রাম, আমার শহর নামে একটি কর্মসূচি নিয়েছে। এর দার্শনিক দিকটি সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বাস্তবায়ন ধারণাগুলো সঠিক করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব না হলে পুরো কর্মসূচির উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। আমরা চাই না বিশৃঙ্খল নগরের সমান্তরালে বিশৃঙ্খল গ্রামীণ জনপদ তৈরি হোক। শহরগুলোতে অপরিকল্পিত নগরায়ণের একটা ধ্যান-ধারণা তৈরি হয়েছে। সেটি আমরা গ্রামে ফেরি করছি। এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গ্রামে দালানকোঠা নির্মিত হচ্ছে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছাড়া। যেখানে আগে কোনো জলাবদ্ধতার ব্যাপার ছিল না, সেখানে এখন গ্রামে জলাবদ্ধতার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। এর সূত্র ধরেই মশা-মাছির উপদ্রব শুরু হয়ে যাবে। বলা চলে, অপরিকল্পিত নগরায়ণের ধ্যানধারণা গ্রামে নিয়ে গেছি। এ প্রবণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমার মনে হয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পরিবেশসম্মত গ্রামীণ জনপদ তৈরি করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করাও জরুরি। আমার গ্রাম, আমার শহর কর্মসূচিতে এ ধরনের দূরদর্শী ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সেখানে শহরের সুযোগ-সুবিধা জোগানো হবে ঠিকই, কিন্তু গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যগুলোও ধরে রাখার প্রচেষ্টা থাকতে হবে। সর্বোপরি নতুন বাস্তবতায় গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষির বিকাশ ত্বরায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিদ্যমান মেট্রোপলিটন প্লাস গ্রোথ করিডর বনাম গ্রামীণ সম্পর্কিত বিভাজন মাথায় নিয়ে গ্রামীণকে কীভাবে আরও বেশি সহায়তা করা যায়, তার জন্য সুস্পষ্ট কর্মকৌশল দরকার। নইলে রূপান্তরের পরবর্তী যাত্রা সহজতর হবে না।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা; নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি এবং চেয়ারপারসন, ব্র্যাক

পল্লী উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও বিআরডিবি

কারার মাহমুদুল হাসান

সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, রাষ্ট্র পরিচালনার সকল আইনকানুনের উৎস ও বাংলাদেশ নামে পরিচিত রাষ্ট্রের সকল উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তি, যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের প্রথম বছর ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের মূলনীতি অংশের ১৩নং অনুচ্ছেদে জাতীয় অর্থনীতি তথা উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয় :

উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে,

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা : অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা : অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের

মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা : অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

কিন্তু স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের নীতি নির্ধারণের বিষয়ে সংবিধানের এই মৌলিক নীতিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। এক সময় শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ১৯৮০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে বিরাষ্ট্রীয়করণকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিখাতের ওপর সমস্ত চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। মাঝখানে রাষ্ট্রের অন্য একটি খাত সমবায়কে বা সমবায়ী মালিকানায় উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনকে নীতিচিন্তায় যথাযথভাবে স্থান দেয়া হয়নি। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সমতালে সমবায় খাতকেও গড়ে তোলার উপযুক্ত আইন কাঠামো, মুদ্রা-ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ইত্যাদি প্রণীত হয়নি বা এখনও হচ্ছে না। বিষয়টি স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত খুবই প্রাসঙ্গিক বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) ১৯৭১-১৯৮১ :

দ্বিস্তর সমবায়ের সাফল্যকে কাজে লাগাতে সরকার সারা দেশে একটি মডেল সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) নামে বাস্তবায়ন শুরু করে। এই কর্মসূচিটির অন্যতম ভালো দিক হলো সরকারের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়সাধন করে জনগণের কাছে পণ্য ও সেবা সরবরাহের একটি কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলা। এই আইআরডিপি-এর আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এগুলো হলো :

কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম

- গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় সংগঠন তৈরি (কেএসএস ও টিসিসিএ/ইউসিসিএ);
- গ্রামীণ মূলধন গঠন;
- কৃষিঋণ কার্যক্রম;
- সেচ সম্প্রসারণ কার্যক্রম;
- বাজারজাতকরণ কর্মসূচি;
- পল্লী ভবন ও গুদাম নির্মাণ কর্মসূচি;
- মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি

- গ্রামীণ মহিলাদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন এবং মূলধন ও পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
- গ্রামীণ মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান;
- গ্রামীণ মহিলাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন;
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

- বিত্তহীন পুরুষ/মহিলা সমবায় সমিতি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দল গঠন (বিএসএস/এমএসএস);
- ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ প্রচলন।

আইআরডিপি-এর কার্যক্রম সরকার ও বিশ্বব্যাংক ১৯৮১ সালে যৌথভাবে মূল্যায়ন করে। এই প্রতিবেদনে টিসিসিএ/কেএসএস সিস্টেমে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে- এটার স্বীকৃতি দেয়া হয়। আইআরডিপি কার্যক্রমে সদস্য ও ঋণ বৃদ্ধি, আর্থিক সক্ষমতা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের চাহিদা ইত্যাদি সকল কিছু সেচ কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় থাকার ফলে সেচের যন্ত্রাংশ ব্যবহার কার্যকর

ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ, উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি, বিআরডিবি, কুড়িগ্রাম।

হয় এবং কৃষি উপকরণ পাওয়ার একটি সহজ মাধ্যম ছিল এই টিসিসিএ। আধুনিক সেচের সম্প্রসারণে আইআরডিপি সফল বলে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। মূলত কুমিল্লা সমবায় থেকে আধুনিক সেচ প্রযুক্তির শুরু, তা বিচ্ছুরণ ঘটে আইআরডিপি-এর মাধ্যমে। এটি ছিল আইআরডিপি'র অধীন নতুন সমবায়ের ক্ষেত্রে একমাত্র বড় অবদান।

টিসিসিএ শুধুমাত্র ঋণ প্রদানের সমবায় না হয়ে একটি বহুমুখী সমবায়ে পরিণত হয়। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭৮টি টিসিসিএ ধান, আলু, চাল, পাট, তৈলবীজ, তামাক, ডাল এবং শুটকি মাছের মার্কেটিং কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়া টিসিসিএ আইআরডিপি চালুর সময় ১৯৭১ সাল থেকেই সারের ব্যবসায় জড়িত ছিল।

কুমিল্লা মডেলের সমবায় এই আইআরডিপি-এর মাধ্যমে সম্প্রাসারিত হয়েছে। তাই সদস্য এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া হতো। থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) কেএসএস-এর চেয়ারম্যান, ম্যানেজার, মডেল কৃষক ইত্যাদির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবেই আইআরডিপি কার্যক্রম চলতে থাকে।

আইআরডিপি-এর কার্যক্রমকে সরকার ও বিশ্বব্যাংক ১৯৮১ সালে মূল্যায়ন করে কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গঠন করে। বর্তমান সময়ে কুমিল্লা মডেলের আলোকে দ্বিস্তর সমবায় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব বিআরডিবি-এর ওপরই রয়েছে।

বিআরডিবি ও সমবায়

গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বিআরডিবি যাত্রা শুরু করে। দ্বিস্তর সমবায়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সংগঠিত করে সংগঠনের মাধ্যমে তাদেরকে মূলধন গঠন, অব্যাহত তদারকি ঋণ সরবরাহ, নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে দেশে যথাসম্ভব স্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখা বিআরডিবি-এর কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া দারিদ্র্যর ঝুঁকি হ্রাস, দারিদ্র্যে নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি মূল কর্মসূচির পাশাপাশি কিছু সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র প্রতিটি প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

বিআইডিএস এর একটি গবেষণায় দেখা যায়, বিআরডিবি-এর পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সকল কর্মসূচি জিডিপি-তে প্রায় দুই শতাংশ অবদান রাখে। এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, নারী উন্নয়ন, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য-স্যানিটেশন ও পুষ্টি উন্নয়ন এবং সম্পদ তৈরিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে দুই দুইবার চাকরিতে সেবাদান করা। একবার ৮০'র দশকের প্রথমার্ধে বিআরডিবি'র একটি প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক এবং সেসঙ্গে পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং ৯০'র দশকের শেষভাগে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের গৌরবদীপ্ত সুযোগ পাওয়া। বলতে দ্বিধা নেই এ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপালন কালে আমি সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি লাভ করেছি, অগণিত প্রশিক্ষিত, কর্মঠ ও সৎ সহকর্মীদের সাহচর্য, উপদেশ লাভের প্রক্রিয়ায় ক্রমবিকাশমান দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিআরডিবিতে বেশি বেশি জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কাজ করার সুযোগ লাভে সমর্থ হয়েছি- যা ছিল আমার চাকরি জীবনের উল্লেখযোগ্য গৌরবদীপ্ত অধ্যায় নিঃসন্দেহে। ১৯৯৪ সালের শেষভাগে আমি কর্তৃক তৎকালীন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয়কে (আমি তখন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত) লিখিতভাবে ১৯৯৩-১৯৯৪ অর্থ বছরের বগুড়া জেলায় বিআরডিবি'র অনুসৃত দ্বিস্তর সমবায় কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করলে দ্রুত উক্ত অর্থ বছরের (১১ মাসের) উক্ত জেলার বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অগ্রগতির যে বিবরণ প্রেরণ করেছিলেন তা ছিল বেশ আশাব্যঞ্জক।

বর্ণিত প্রতিবেদনে বিআরডিবির বিভিন্ন কার্যক্রম, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ইত্যাদি সম্পর্কিত যে চিত্র পরিবেশন করা হয়েছে তা এখন পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং তা অবলোকন ও পর্যালোচনা করে দেখা দরকার দেশের নীতি নির্ধারকদের। উন্নয়নমূলক এমন কোনো ক্ষেত্র নাই (গ্রামে বা থানায়) সেখানে ড. আখতার হামিদ খানের উদ্ভাবিত দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতি পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। প্রায় সকল জেলায়ই বিআরডিবি এ ধরনের কার্যক্রম (কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ, গৃহপালিত পশু-পাখির টীকা/ইনজেকশন প্রদান, সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ কার্যক্রম ইত্যাদি) গ্রহণ করে চলেছে বিভিন্নমুখী প্রতিকূলতা ও বৈরী অবস্থা সত্ত্বেও।

দ্বিস্তর সমবায় দর্শন এর প্রবক্তা ড. আখতার হামিদ খানের জন্ম ১৫ জুলাই, ১৯১৪ সনে তৎকালীন অখণ্ড ভারতের আগ্রায় এবং ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর তারিখে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লায় ১৯৫৯ সালে তার দ্বিস্তর সমবায় দর্শন প্রণয়ন, বিকাশ সাধন ও বাস্তবায়নকল্পে কুমিল্লা আগমন করেন (প্রথমদিকে তিনি কিছুকাল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন) এবং এক দশকেরও অধিককাল তার কুমিল্লা মডেল দ্বিস্তর সমবায় উদ্ভাবন ও বিকাশে ব্রতী হন। ১৯৭৭ সালে তিনি কিছুকাল বগুড়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমিতে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট গবেষণায় কয়েক মাস নিজেকে নিয়োজিত রেখে সম্ভবত বৈরী পরিবেশের কিংবা কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান।

এ মহাপুরুষ ১৯৮৭ সালের শেষদিকে কোনো একদিন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (কাওরান বাজার), ঢাকা অফিসে কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিলেন। আমি তখন বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন) এবং জনাব হাসনাত আবদুল হাই মহাপরিচালক এর দায়িত্বে ছিলেন। এরপর পাকিস্তানের লাহোরে এক কনফারেন্সে যোগদানকালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস একাডেমির প্রিন্সিপাল কর্ণধার বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে রাতের ডিনারে দাওয়াত দেন। সে দাওয়াতে ড. আখতার হামিদ খানও উপস্থিত ছিলেন। এই ছিল খান সাহেবের সাথে আমার শেষ দেখা। বিআরডিবি, দ্বিস্তর সমবায়, কুমিল্লা মডেল এসবের কথা মনে হলেই ড. আখতার হামিদ খানের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করে বিআরডিবি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এ লেখার এখানে ইতি টানছি।

কারার মাহমুদুল হাসান, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উদ্বোধনকৃত বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রধান সমন্বয়কারী (১৯৭৪ সাল)

এ নিবন্ধ লেখায় বোর্ডের উপ-পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এবং জনাব হাসনাত আবদুল হাই এর নিবন্ধ থেকে তথ্যাদি নিয়েছি, সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

Rural Development in Bangladesh: A Historical Perspective

Dr. Tofail Ahmed

Part- 1 : Introduction

Definitions and problem with definitions : By Rural Development (RD), we use to understand, development of rural areas and development of the quality of life of people live in the rural areas.

RD is equated in most of the time with a sort of area development strategy. It is (RD) also often misconceived as 'agricultural development' only.

RD May also be regarded as the transformation process of traditional societies towards modernity.

The term 'rural' is often misconstrued as the living hub of 'backward', 'uncultured', 'illiterate' ,'ignorant', 'superstitious' and narrow minded people. Rural areas

are characterized as 'isolated', 'remote' and scattered settlement of rustics. It also characterized as 'peasant settlement' in a 'closed society' with 'fatalistic culture'. On the contrary, rural areas or villages in Bangla literature has been portrayed as a serine, peaceful and full of aesthetic beauty. There were common stories many miseries too.

Contextualization- Problematic clarified from the greater historical canvas

All governments at a certain stage of history were 'Local Governments'. In the same way, I like to say, at a particular juncture of human history, all societies were 'rural'. An old proverb says," God made the country, men made the towns". Consequently "all developments were essentially Rural Development (RD)".

All definitions in Social science are contextual. Theories and definitions are like shoes, to be fixed in the feet of individuals to walk comfortably and societies to make them fit to progress and maintain stability. The shoes are of standard size but feet differ in sizes. What to do to fit the standard size shoes in all the different sizes of feet? Are we going to cut the feet to fit into the shoes or remake the shoes to fit the feet? Let us please find the answer by ourselves. One particular definition is not applicable for all times to come. Each and every definition represents some realities (surface reality or inner reality) of the particular time and space.

In the past, RD was an essential community effort or private philanthropic activity. Look at the history of educational institutions initiated hundred years ago, similarly many of the public works such as road, culvert, bridges, water reservoirs were established either by communities with private philanthropic assistance or by individuals. Later, state intervention started and took it over. For example, schools established by community or private persons were nationalized; Roads and bridges were repaired, maintained and improved with state fund. Ultimately, at some stages, **community retreated and state become the dominant player.** The RD in contemporary development discourse is mostly treated as projects and programs of state (national, regional and local).In reality , it is pre- dominantly cumulative efforts and initiatives of individual, family, community and non- state private actor and state of various nature and types. RD is also an integral part of human history that moved from one stage to the other. Because of my approach of attaching historical sense in the total discourse, I prefer to replace the term and concept RD into 'Social transformation'. We may elaborate the issue later.

The role of state in influencing people's life enormously changed over the time. State in the ancient (BC), mediaeval (600 AD on ward) and modern (1800 onward) is not the same. Life and livelihood, state and society, interpersonal and social relationship, dreams of destiny, relationship between men and women, ruler and the ruled, employer and employee, means of production, factors of production, forces of production, relations of production, distribution of production and consumption pattern; all have changed and transformed. The proportion of changes is so great and enormous that it is insufficient to compare them between 'Earth and the Heaven'. It began from 'hunting,-fishing- food gatherer's stage of human life to nomadic tribes having no idea of private ownership that Karl Marx called 'primitive communist' stage to modern and postmodern 'capitalist' and 'late capitalist' societies of wider varieties(Ahmed 2012).

The Beginning and End of 'Rural-Urban' Divide

History turned into a new era with the growth of 'cities' and 'towns' from the womb of feudalism. The fleeing artisans (bonded labor) with the instigation from merchants created new settlements and these were the earliest cities in the world. Cities symbolized dynamism in human history, freedom from servitude and created an epoch making history- a new 'mode of production' leading towards industrialization and urbanization. Feudal lords lost political and economic power to urban bourgeoisie and the comprador bourgeoisie. Rural life, living and livelihood gradually have been thrown into perpetual despondency, misery, exploitation and neglect. Urban centers were becoming the main engines of growth, creation of asset, hub of science, technology and innovations, center of political and economic power and civilization, culture, comfort and leisure .Only 5 to 10 % of global population in the 1900 were enjoying the facilities associated with urban life. Around 2030 to 2040 more than half of the population will be living in the urban centers and other half of the remaining population will be living in the suburban areas (Ahmed, 2016).

'Rural Development' as State intervention is a Post Second War phenomenon

Like many other countries of the world during the post- colonial era, thinking for vast majority of rural people began as an imperative for having a balance within the states and nations. In India, Community Development (CD) was lunched under Nehru's effort and in Pakistan, Village Agricultural and Industrial Development (V- AID) program was initiated with US support. Later Saemaul Undong in South Korea, *Ujjamaa* (a version of African Socialism) in Tanzania under Julius

Nay rare, *Kibbutz (* Community living*)* in Israel got wider currency. In the countries of socialist bloc, massive work began with the rural population; in former USSR under 'Soviet system' (Lenin's slogan- 'all power to the Soviets'), Chinese post revolution rural development under *Mao Tse Tung* began with regimented land reform supported by *'production team- production brigade- commune system* and Yugoslavian cooperatives are also some of the examples of rural development in Socialist countries in the 1950s and 1960s. In the west Europe and Scandinavia, *Cooperatives* played a pivotal role in boosting agricultural and dairy production and also supplying consumer goods (Japan is Champion of Consumers Cooperatives) among the relatively less well-off people of their respective societies.

Rural Development as Integral Part of National Development

In almost all the national planning documents of the developing countries from 1950s to 1990s, RD used to occupy a distinct place. All the national governments committed resources, new institutions were created and lot of new projects were developed keeping agricultural development and boosting food production at the center. The dominant RD strategy in post second war period was- 'modernization of agriculture' with new package of 'seed- fertilizer- insecticide- irrigation technology' under a new brand name of a development movement known as "Green Revolution" and "grow more food" concentrated on enhancement of agricultural productivity . The agricultural production was substantially increased but inequality in rural areas widened and landlessness also increased. It did not help to reduce poverty rather poverty index continue to rise due to demographic and inequality factor. Riches were getting richer and poor and landless were not substantially benefited from trickle down growth approach of 'Green Revolution'.

New thinking begun in the 1970s, there were certain highly visible policy shifts. It has been criticized that the RD served the interest of relatively rich farmers and poor and landless were by-passed. A new approach called 'target group' approach was tried by NGOs keeping the poor and landless at the center of intervention. The concept of *micro credit* emerged as the by-product of targ*et* group approach. The non-government initiatives beyond the domain of 'agriculture' regarded as grand success. The NGOs emerged

Rice harvesting by cooperative farmers, BRDB, Godagari, Rajshahi.

as new development agent and actor and private sector intervention in RD and Poverty alleviation gradually expanded. As conceptual discourse 'Poverty Alleviation' to a large extent replaced the term 'RD' in the late nineties.

In Bangladesh, Integrated Rural Development Programme (IRDP) started as the biggest RD programme during the post liberation period with First Five Year Plan (FFYP: 1973-1978) of Bangladesh. It basically started to implement the 'Two-tier Cooperative' innovated under 'Comilla Approach'. It initially started with formation of KSS (Farmer's Cooperative) at the village level and federating those at Thana level under TCCA (Thana Central Cooperative Association). Later, IRDP was upgraded into a full-fledged autonomous body as BRDB (Bangladesh Rural Development Board) and converted to the fountain of rural development programmes and projects of GOB. It started target group projects, women projects and poverty focused projects. Most of the donor supported rural development projects were concentrated under the management of BRDB. Later, in 1990s with the changes of global aid policy donors started withdrawing their support from governments and shifted their support towards private and voluntary sectors(Saha and Ahmed 1998). The GOB and BRDB both retreated and NGOs and private sector started flourishing. The GOB gradually reemerge in the support of poor in form of safety net and BRDB is not a dominant player in the safety net management.

In this connection World Bank (1975) and the emergence of BRAC, Proshika, Grameen Bank may be an eye opener to understand the shift of RD discourse in Bangladesh and elsewhere.

'Rural Development' at the Turn of the New Millennium

RD at the turn of the millennium lost much of its steam and rigor. Programs and project are continuing with different emphasis and objectives. For example, UN Millennium Development Goals (MDGs) from 2000-2015 and Sustainable Development Goals(SDGs- 2016 to 2030) overtook the traditional concept of RD. In the last few decades, 'Poverty Alleviation' had become an overarching and all-encompassing concept that absorbed all the governmental and donor efforts which previously RD had been occupying. The poverty alleviation effort addressed both urban and rural poor and less well of people under the same blanket and 'wellbeing' has become the cardinal entry point of the concept.

The other dimension that contributed pushing RD in the back foot is the growing trend of urbanization globally. More and more people are living in the urban centers compared to even 20 years back and it is happening so rapid and quick that resources being rechanneled to urban services. Rural to urban and international migration is an order of the day. On the other hand, people living in the rural areas also aspiring for urban facilities. Urbanization is aggressively in the process of expansion and rural areas are in the process of contraction. Villages in many countries are not any more remote and isolated, they are having the advantages of connectivity (physical and virtual both). There are inequality, discrimination, deprivation and lack of opportunity between the core and the periphery. The MDGs and SDGs are trying to address many of those with all inclusive manners. It not only addresses the economic deprivation issues, it includes gender, human right, governance, environment, climate, culture, health, housing, education etc. all in a single but comprehensive package.

Part-2 : Rural Development projects and programs in historical perspectives

Approaches o the study of RD

- Philanthropic Approach (Christian Missionaries and private philanthropist like Haji Mohammad Mohsin)
- Spiritual Approach (M.K.Gandhi)
- Aesthetic Approach (Rabindranath Tagore in Sreeniketan and Shahjad pur)
- Community Approach (Israeli Kibutz, indian Sharbodoya Movement and many others)
- Bureaucratic Approach (F.l.Bryant in Punjab,Guru Shadoy Datta and Bratachari movement, TIM Nurun Nabi, N.M. Khan, ishaque and officials of British India initiated many RD programmes in their respective work stations in The then Pakistan)
- State intervention Approach-China through Commune system, Tanzanian Ujjama approach, South Korean Saemaul Undong
- Institutional Approach (Akhter Hameed Khan and Comilla Approach)
- Professionally organized private-voluntary approach (Brac, GK and Grameen Bank)

Strategies of RDs

- Community vs. Target group
- Formal vs. informal group
- Credit as fundamental right
- Women and gender dimension
- Environment dimension
- Infrastructure and services

Pioneers in RD and Poverty Alleviation

- M.K .Gandhi
- Rabindranath Tagore- Nobel laureate in literature in 1913
- Norman Ernest Borlaug- Nobel Laureate for Peace in 1970 US)
- Akhter Hameed Khan (Pakistan-Bangladesh)
- Joy Parkas Narayan (India-

Sharbodaya Movement)
- Julius Nay rare(Tanzania)
- Arya Ratna (Sri Lanka)
- Mohammad Yunus-Nobel laureate for peace-2006 (Bangladesh and later spread globally)
- Sir Fazle Hasan Abed (Bangladesh and many other countries under BRAC International)
- Zafarulla Chowdhury(Through GK-People centered health system)

Chronology of RD projects and Programs

- British India-Great Bengal Famine-to support Farmers and agriculture-Multi-purpose Cooperative Society started from 1904.
- V-AID (1950-1960)
- Comilla model-Rural Administration experiment-New Cooperative movement-RWP-TIP-Rural Education, Women's development-agricultural modernization (1960 onwards)
- Comprehensive Village Development Program (CVDP -1974 onward)
- Emergence of NGOS in Bangladesh (1973-onward)
- Micro Credit panacea (1980s)
- Retreat of state- privatization, marketization and Structural adjustment (1990s)
- Ekte Bari Ekti Khamar (One house one Farm) New savings program in contrast to credit(1997), later renamed as Amar Bari Amar Khamar and Polly Sanchaya Bank.
- MDG-2000-2015
- Safety net and Social Security programmes/policy (2015).
- SDG-2015-2030

Conclusion

Bangladesh made a remarkable progress in alleviating rural poverty during the last 20 years in achieving the substantial reduction of poverty and building rural infrastructure. As regards the MDGs, Bangladesh could maintain the consistency with the targets set in the MDG document. Poverty incidence in Bangladesh came down to half less than 20% and extreme poverty also brought down substantially (10%) during the period. Improvement in the health, sanitation, education and gender development proved remarkable. Though the Covid- 19 in the years 2020-2021 created an adverse effect on the ongoing progress and the fall back to poverty trap for the time being reoccupied some space. Many of the program models of Bangladesh are now being replicated in other countries and societies. Institutional model building in Bangladesh began with "Comilla Approach" in the 1960s. It substantially changed the mind set of rural development thinkers and practitioners. In the post 1970 periods, the BRAC experiences of RD proliferated and diversified in rural health, education, different specialized production such as rural crafts, dairy, poultry, etc. and Grameen *model of micro credit* and social business (Yunus 2008, 2010 and 2015) become the brand names of RD and poverty alleviation all over the world in improving people's lives and livings as well as development of greater human potentials. The latest GoB efforts towards 'National Social Security Strategy' (GoB 2015) is striving towards transforming the country into an ideal 'welfare state' in the context of a developing country. In the current development documents such as FYDPs, Vision 2041 and Delta Plan 2100 'rural development' does not feature in a visible way as a separate sector, it (RD) is regarded as part of national development through accelerated growth and a country with higher income and less poverty incidence. All traditional RD institutions created during the 1960,1970s and 1980s have to rewrite their new roles under the changed situation and new global and national realities.

Dr. Tofail Ahmed, Ph.D. : Researcher, Trainer, Teacher and Development Practitioner (Consultant)

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন ভাবনাসমূহ

মোঃ হুমায়ুন খালিদ

'পল্লী উন্নয়ন' অব্যশই উন্নয়ন ধারণার একটি মৌলিক বিষয়। একটি সেতু, একটি সড়ক, দালানকোঠা নির্মাণ করে দিলেই শহরের দৃশ্যত উন্নয়ন হয়েছে বলা সম্ভব হলেও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুরূপ কথাটি বলার সুযোগ নেই। কারণ পল্লী উন্নয়ন ধারণাটি অবশ্যই মানসকাঠামো গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানসকাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং নিজের করে ভাবার বিষয়। কোনোকিছু চাপিয়ে দেয়ার প্রসঙ্গটি এখানে মূল্যহীন। উপকারভোগীরা যখনই উন্নয়নকে দরদ দিয়ে নিজেদের আর্থসামাজিক অস্তিত্বের অংশ মনে করে তখনই উন্নয়ন টেকসই হয়। যখন উপকারভোগীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়েই নিজেদেরকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত বা অংশগ্রহণ করতে পারে তখনই প্রকৃত উন্নয়ন ঘটে।

ষাটের দশকে দেশে সদা বিরাজমান খাদ্যঘাটতির প্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের সময় প্রধানত খাদ্য

উৎপাদনের ওপরই গুরুত্বারোপ করে আসা হতো। ঐ সময় খাদ্যঘাটতির সঙ্গে ভূমি কাঠামো একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এখন প্রযুক্তিগত উন্নতি, উন্নত বীজ ও সারসহ অন্যান্য ব্যবস্থার কারণে পূর্বের সে অবস্থা আর নেই। বাংলাদেশে কৃষিখাতকে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মৌলিক মনে করা হলেও কৃষিই যথেষ্ট নয়। বর্তমানে জটিল প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজে কৃষির সাথে আরও অন্যান্য সেক্টর এমনকি কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) খাতকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। একই সাথে কৃষিখাতকেও আধুনিক কৃষি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আশির দশকে মনে করা হতো পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে- দারিদ্র্য হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুসম বণ্টন, মজুরভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মৌলিক অবকাঠামো সৃষ্টি করে গ্রামীণ জীবনমান বৃদ্ধি, স্থানীয় সম্পদ, পরিবেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, গ্রামীণ মূল্যবোধ কাঠামো জোরদারকরণ প্রভৃতি বিষয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। রাতারাতি কিছু হওয়ার সুযোগ এখানে নেই। পল্লী উন্নয়ন বা গ্রামোন্নয়ন হচ্ছে একটি বৃহত্তর পরিসরভিত্তিক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উভয় দিক থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর পাড়ি দেয়া সম্ভব হলেও দ্বিতীয় স্তরে ওঠা কঠিন হতে পারে। আবার দ্বিতীয় স্তরে ওঠা সম্ভব হলেও নানাবিধ কারণে পুনরায় প্রাথমিক স্তরে অবনমনের আশঙ্কা থেকেই যায়। উন্নয়ন ধারাক্রমিক ও টেকসইমূলক না হওয়াতে এরূপ ঘটে থাকে। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং আয়-উৎসারী কর্মসূচি জরুরি। তার সাথে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তির সংযুক্তি ও সহায়ক পরিবেশ। এজন্যই দরকার সরকারি-বেসরকারি উভয়ের সমন্বিত উদ্যোগ। স্থানীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন গড়ে তুলতে হবে তেমনি গ্রামে উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনা বাড়াতে হবে। পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট এ ভাবনার সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত থাকতে হবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যেমন- বার্ড, আরডিএ, বাপার্ড, বার্ক ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ফলকে কাজে লাগাতে হবে। আবার সকল গবেষণা ফলকে পর্যালোচনা করে তার নির্যাস নির্ণয়পূর্বক অগ্রাধিকার নির্বাচন করে প্রতিটি এলাকার জন্য আলাদা আলাদাভাবে এগুলোর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ মূলত গ্রাম প্রধান দেশ। সুতরাং বেশিরভাগ মানুষের জীবন-জীবিকার মূলভিত্তিও সেখানেই। আবার গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক এবং ক্ষুদ্রকৃষক। অথচ ভূমিই গ্রামীণ জীবন জীবিকার মূল ভিত্তি। এ ভূমিকে কেন্দ্র করে কৃষিকাজই হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৃহৎ ক্ষেত্র। এ কৃষি দিয়েই মূলত গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান বা স্ট্যাটাস চিহ্নিত হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যেমন-সমবায় সমিতি, সাধারণ সমিতি গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি , কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিপণন, সংরক্ষণ, প্রযুক্তির প্রয়োগ, আরএনএফ বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রের সাথে সাথে গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক কাজও পাশাপাশি চলতে হবে। এ কার্যক্রমটি সকল জাতিগঠনমূলক সংস্থার ক্ষেত্রেই কার্যকর করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এ সাব-সেক্টরটি বেশি লাভজনক। গ্রামীণ যুবদেরকে কৃষিতে যতটা না আগ্রহী করে তোলা যায় তার চেয়ে বেশি আগ্রহী করে তোলা সম্ভব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কাজে। এ খাতের প্রোডাক্ট বিপণন করাও সহজ। দেশের সর্বত্র 'প্রদর্শনী খামার' স্থাপন করে এবং সহজ প্রশিক্ষণ দিয়ে এ খাতের বিপুল উন্নয়ন সাধন করা যায়। এ সাব-সেক্টরে সফলতার অনেক নজিরও রয়েছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। জনগণের প্রায় ৪০% ভাগই যুবশ্রেণির অন্তর্গত। জনবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ অংশকে কাজে লাগাতে হলে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। কৃষির সর্বমুখী উন্নয়ন দরকার। বাংলাদেশে কৃষির জন্য কিছু করতে হলে তা করতে হবে অবশ্যই কৃষকদের কৃষিপণ্যের বাজার ও উপকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে। এ সংগঠন সমবায়ভিত্তিক হোক কিংবা দলভিত্তিক কাঠামোর মাধ্যমেই হোক। এক কথায় বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের প্রাণভ্রমর হচ্ছে সংগঠনভিত্তিক কৃষি।

বর্তমান পৃথিবী জ্ঞানবিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করছে। আইসিটি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ও মাত্রা দিনদনি বাড়ছে। এমনকি গ্রাম পর্যায়েও এর ছোঁয়া লেগেছে। এখন দরকার সঠিক নীতিমালা, যাতে আরও বেশি মানুষ এমনকি দরিদ্র মানুষও আইসিটি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। কৃষিসহ পল্লী উন্নয়নের কাজের সঙ্গে আইসিটিসহ অন্যান্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করছেন বিআরডিবি সাবেক মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ।

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং তার আগে ২০৩০ সালের গ্লোবাল এজেন্ডা এসডিজি অর্জনের জন্য সিএমএসএমই খাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধানতম কারণসমূহ নিম্নরূপ-

- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব। অন্যদিকে, বেকার সমস্যা আরও দশটি সমস্যার কারণও বটে। অথচ সিএমএসএমই খাত সবচেয়ে বেশি

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম ।

- সিএমএসএমই খাতের বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য দরকার হচ্ছে চক্রভিত্তিক সুরক্ষা, যা সিএমএসএমই খাত দিয়ে থাকে। অর্থাৎ আয়ের একটি পথ রুদ্ধ হলে অন্যান্য পথ বিঘ্নহীন থাকে।
- পরিবারের একাধিক সদস্য সিএমএসএমই খাতের সঙ্গে দিনের কোনো না কোনো ভাগে সম্পৃক্ত থাকে বিধায় স্বাভাবিকভাবেই এ খাতে অলস শ্রম-ঘণ্টা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাতে পারে।
- বড় বড় শিল্পে বিনিয়োগ বেশি হলেও কর্মসংস্থান বেশি সৃষ্টি হয় সিএমএসএমই খাতে।
- উদ্যোক্তাগণ নিজেদের মেধা শক্তি কাজে লাগাতে শিখে এবং নানা উদ্ভাবনও সম্ভব হয়, যা সামগ্রিকভাবে জাতিকে অগ্রগতির দিকেই নিয়ে যায়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায় এবং আনুষ্ঠানিক চাকরির পেছনে অযথা ছুটাছুটির প্রয়োজন হয় না। অন্যরাও দেখে শেখে।
- বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এতে সকল এলাকার সকল সম্পদ ও মেধা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- সিএমএসএমই কার্যক্রমের মাধ্যমেই নিজেদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং সামাজিক জীবনমান বৃদ্ধি ও শান্তিময় হয়।
- বড় বড় শিল্পের জন্য যে সকল কাঁচামালের দরকার হয় সেই কাঁচামালভিত্তিক সিএমএসএমই উদ্যোগও গড়ে উঠতে পারে।
- ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে নিজেদের ক্ষুদ্র আকারে সঞ্চিত অর্থ এ খাতে তহবিল আকারে বিনিয়োগ হয় এবং ধীরে ধীরে বিনিয়োগের পরিমাণ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- দেশে ব্যবহার ও বিদেশে রপ্তানির জন্য হালকা শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই কাজে জনমিতি লভ্যাংশ (Demographic dividend) কাজে লাগানো যেতে পারে। এজন্য দরকার যুবকদের দক্ষ করে তুলে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ করার পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, যা সিএমএসএমই খাতের বিকাশের মাধ্যমে সম্ভব।

এ সকল সুবিধাদি বিবেচনায় নিয়ে সিএমএসএমই খাতকে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে গ্রাম শহর নির্বিশেষে সকল শ্রেণির দরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা, যৌথ উদ্যোগ, যৌথ তহবিল এবং যৌথ শক্তি সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এজন্য সকল পর্যায়ে সমবায় কিংবা সমবায়ের অনুরূপ কোনো না কোনো সংগঠন খুবই জরুরি। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদের দ্বিতীয় খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এ লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর যেমন আছে, তেমনি সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমি, সমবায় ক্যাডারভিত্তিক কর্মকর্তা এবং জাতীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমবায় সংগঠনও বিদ্যমান। বলতে গেলে, প্রায় পৌনে দুই কোটি ছোট বড় সমবায় সমিতি রয়েছে। সমন্বিতভাবে এগুলোর সম্পদ, মূলধন, জনবলও কম নয়। যদিও সময়ের বিচারে এগুলো সবই সামান্য অর্জন । জাতির পিতার ভাষ্য অনুযায়ী দেশের আনাচে কানাচে পড়ে থাকা এ সম্পদ ও সম্ভাবনাকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সাংগঠনিক ভিত্তি হচ্ছে উত্তম। প্রতিবেশী দেশ নেপাল অল্প সময়ের মধ্যেই সমবায় কার্যক্রমে বেশ এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সমবায় সমিতিগুলো তাদের অর্জিত মূলধন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহার করে থাকে। অথচ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে তহবিল যথাযথ ব্যবহারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করেই ঋণ প্রদান করা হয়। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ঋণের অর্থ ব্যবহারের জন্য দক্ষতা অর্জনের কোনো প্রশিক্ষণও দেয়া হয় না। ঋণের অর্থ উদ্দেশ্যমাফিক ব্যবহৃত হয় না। আবার এক প্রতিষ্ঠানের ঋণ দিয়ে আরেক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ করে কিংবা পুনরায় ঋণ নিয়ে আগের কিস্তি পরিশোধ করা হয়। এতে কোনো তদারকি থাকে না। ফলে ঋণের পরিমাণ এবং সার্ভিস চার্জের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়ে ঋণগ্রস্ত সদস্য এক পর্যায়ে খেলাপি হয়ে ক্ষুদ্র ঋণের দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত সমবায় সমিতি ছাড়তে বাধ্য হয়। ফলশ্রুতিতে সম্ভাবনাময় সমবায় প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে যায় এবং সদস্যগণ তাদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের অর্থ খেয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থার দরুনই বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সমবায় খাত বদনামের মধ্যে পড়েছে। বলা যায় যে, এজন্য সমবায় ব্যবস্থা দায়ী নয়, বরং দায়ী হচ্ছে সমবায় যারা করে তারা এবং নেতৃত্বে যারা থাকে। অন্যদিকে, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মতো বিআরডিবি কর্তৃক দলভিত্তিক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমও একই ধারায় পরিচালিত হয়ে আসছে। অথচ যদি এ সকল সমবায় সমিতি ও সংগঠন বা দলকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আন্তরিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের চেহারা অন্যরকম হতে পারত। এজন্য দরকার ঋণ প্রদানের আগে প্রশিক্ষণ, সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই, তদারকি, বাজারজাতকরণে সহযোগিতা, ঝুঁকিবিমা চালু, নতুন নতুন উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা, ঋণ গ্রহণের পুনরাবৃত্তি রোধ ইত্যাদি।

পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে খুব বেশি সংশ্লিষ্ট থাকার কারণেই স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগের নাম সুনির্দিষ্টভাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। কিন্তু বাস্তবে উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা ও কর্মসূচির বাইরেও অনেক সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পল্লী উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, দল গঠন ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালনসহ অনেক জাতিগঠনমূলক সংস্থা/বিভাগও রয়েছে। সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে সার্বিক পল্লী উন্নয়নের কাজে পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় বিভাগের কর্মসূচিই যথেষ্ট হবে না। এজন্য অন্য সকল সংস্থার মধ্যেও একটি কার্যকর সমন্বয় জরুরি। গ্রাম উন্নয়ন উদ্যোগ তখনই সফল, টেকসই এবং মানুষের নিজস্ব উদ্যোগ হিসেবে গণ্য হবে যখন একটি গ্রামের উন্নয়ন ধারণা ঐ গ্রামের মানুষের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে তাদের নিজস্ব সম্পদ, সম্ভাবনা, তাদের চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মতো করে, গ্রামীণ মৌলিক প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের কারিগরি, প্রযুক্তিগত, আর্থিক, কাঠামোগত সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করলেই যথেষ্ট হবে। যদি বাহির থেকে সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা হয় তাহলে তা স্থায়িত্ব পাবে না বা টেকসই হবে না; বরং গ্রামোন্নয়নের নামে গ্রামের মানুষের কাছে অতীতের অনেক কর্মসূচির মতো ভুল বার্তা যাবে। গ্রামের সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, প্রশিক্ষণ দিয়ে, সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ-সুবিধা সংস্থানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে প্রস্তুত করেই এ কাজটি করতে হবে। প্রথমে গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সম্পদ, সম্ভাবনা ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে বড় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তার আওতায় ছোট ছোট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে অগ্রসর হতে হবে।

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেহেতু কৃষি উন্নয়নই পল্লী উন্নয়নের গোড়ার কথা সেহেতু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে

সুফলভোগীদের পাটি তৈরী, বিআরডিবি, কালিহাতি, টাঙ্গাইল

দেখা যায় যে, এদেশে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার কথা চিন্তা করেই অনেক আগে একটি স্টাডি ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি সূচিত হয়েছিল। এ সমন্বিত উদ্যোগটির ৪টি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট ছিল- থানা ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (টিটিডিসি), পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী বা কৃষি সেচ ব্যবস্থা এবং দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থা। এ কর্মসূচির সফলতার সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয় বিআরডিবি। কিন্তু কালক্রমে বিআরডিবি'র আওতায় থাকে শুধু প্রশিক্ষণ ও দ্বিস্তর সবমায় ব্যবস্থা। অন্যদিকে টিটিডিসি কনসেপ্টের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে উপজেলা প্রশাসন। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা কনসেপ্ট নিয়ে গড়ে ওঠে বিএডিসি। আর পল্লী অবকাঠামো কনসেপ্ট নিয়ে গড়ে ওঠে বর্তমানের এলজিইডি। উল্লেখ্য, চারটি কনসেপ্ট নিয়ে চারটি বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও সাথে সাথে উঠে যায় সমন্বয় কনসেপ্ট। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপজেলা পর্যায়ে দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থার আইনগত নিয়ন্ত্রণ আছে সমবায় অধিদপ্তরের হাতে, আর অপারেশনাল দায়দায়িত্ব বিআরডিবি'র। উপজেলা পর্যায়ে এক সময়ের সফল দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার মূল কারণটি নিহিত রয়েছে এখানেই।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন প্রতিটি গ্রামে একটি করে সমন্বিত সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে। জমির মালিকসহ ভূমিহীন কৃষককে তিনি শ্রমের বিনিময়ে এ সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ৩০ জুন ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে একটি বাণী দিয়েছিলেন "বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে, আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। আসুন, সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।" বঙ্গবন্ধুর এ বাণীই পল্লী উন্নয়ন ও পল্লীর মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের মূল কথা। বঙ্গবন্ধুর উক্ত বাণী বিশ্লষণ করলে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের মৌলিক কয়েকটি দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন-

- এ বাণীর ধ্বনি প্রতিধ্বনি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালে বিদ্যমান সংবিধানের পরতে পরতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে গ্রামোন্নয়নের বৃহত্তর নির্দেশনা রয়েছে;
- পুরো বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল। তিনি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন;
- পুরো বাংলাদেশই তাঁর ধ্যান ও আরাধনার বিষয়বস্তু;
- তিনি স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্যের খনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পল্লীকে ঘিরে;
- ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ সকল রসদপত্র অব্যবহৃত বা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। এগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে প্রকৃতপক্ষে উদ্ভাবনের কথাই বলেছেন।
- সম্পদ সৃষ্টি ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি অনেকগুলো কৌশলের মধ্যে সমবায়

ব্যবস্থাকে একটি জাদুকরী কৌশল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সমবায় প্রসঙ্গে উক্ত বাণীর এক পর্যায়ে তিনি উল্লেখ করছেন যে, সমবায় সমিতিতে অসাধু উপায় অবলম্বনকারীদের কোনো জায়গা নেই এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

- বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা ছিল বাঙালি জীবনের জয়গান গাওয়া। তিনি জীবনের জয়গান গাওয়ার প্রকৃত ভিত্তি গ্রামোন্নয়নের মধ্যেই খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিলেন।

নতুন সংবিধানে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সম্পদের দ্বিতীয় মালিকানা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি গ্রামেও এ পর্যন্ত কোনো সমন্বিত সমবায় সমিতি সাফল্যজনকভাবে গড়ে উঠেনি। যদিও এ লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে জাতির পিতার এই মর্মবাণী আমরা উপলব্ধি করে সে পথে অগ্রসর হচ্ছি না। অন্তত মুজিববর্ষে আমাদের এ বাণী উপলব্ধি করে তদনুযায়ী অগ্রসর হওয়া জরুরি। বঙ্গবন্ধুর বাণীর বিশ্লেষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। বঙ্গবন্ধুর এ চিন্তাকে কাজে লাগানোর জন্য এখন প্রতিটি উপজেলায় ইউসিসিএ'র কার্যক্রম জোরদার করে প্রতিটি গ্রামে সমন্বিত কৃষক সমবায় সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য সমবায় আইনকানুনের জটিলতাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। একই সঙ্গে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র দ্বৈততা ও সমন্বয়হীনতাকে কার্যকরভাবে দূর করতে হবে। ভাবনার বিষয় হচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠান দুটি একই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হওয়া সত্ত্বেও এর কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অনেকটাই মিল থাকায় এবং এজন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মনোভাব মাঠ পর্যায়ে বিরাজমান থাকায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে একটি কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা জরুরি। এক্ষেত্রে এক বা একাধিক প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে এ সেবা পরিচালিত হওয়া জরুরি। একটি উপজেলাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষমূলকভাবে উক্ত সমন্বিত উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে ।

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন তথা গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই এনজিও কার্যক্রম নিবিড়ভাবে জড়িত। তবে এনজিও'র সংখ্যানুপাতে অর্জিত অগ্রগতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর অর্থ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে এনজিওগুলো আশানুরূপ ফল অর্জন করতে পারছে না। তবে কমবেশি যাই হোক এনজিও কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত উপকারগুলো পাওয়া যাচ্ছে-

(১) সরকারি কর্মসূচির সম্পূরক ও পরিপূরক ভূমিকায় রয়েছে;
(২) গ্রামোন্নয়নে অনেক উদ্ভাবমূলক কর্মসূচি/ অ্যাপ্রোচের সূচনা ঘটেছে;
(৩) অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এনজিওদের মাধ্যমে হচ্ছে;
(৪) দুর্গমাঞ্চলে সরকারের অনেক কর্মসূচি/ সেবা না পৌঁছলেও এনজিও কার্যক্রম পৌঁছতে পারছে;
(৫) গ্রামের অনেক অতি অনগ্রসর পকেট এরিয়া আছে যেগুলোতে এনজিও কার্যক্রম সহজে পৌঁছে যাচ্ছে;
(৬) সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যই সুনির্দিষ্টভাবে অনেক এনজিও নিয়োজিত আছে;
(৭) গ্রামের দরিদ্র ও স্বল্প দরিদ্র মানুষের জন্য পুঁজিও সরবরাহ করে থাকে;
(৮) পণ্য উৎপাদনসহ পণ্যের বিপণনের নেটওর্য়াকও গড়ে তুলেছে অনেক এনজিও;
(৯) বিভিন্ন এনজিও গ্রামের মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চালিয়ে আসছে।

এ ধরনের ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কারণে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিওকে নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। সমালোচনার উর্ধ্বে না থাকলেও এনজিও কার্যক্রমকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই; বরং জিও-এনজিও কোলাবোরেশন সার্বিকভাবে বৃদ্ধি করে এবং এনজিও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি কাজেও যেমন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি এনজিওর ক্ষেত্রেও তা' নিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই পল্লী উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন পল্লীর সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সক্ষমতা সৃষ্টি এবং সৃষ্ট সক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হয়। বর্তমান যুগে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। প্রযুক্তি সংযোগ সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে। মানুষের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারিক/ সামাজিক শিক্ষার চেয়ে কোনো উত্তম বিকল্প নেই। একই সাথে গ্রামে সাধারণ শিক্ষাও জোরদার করা প্রায়োজন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে তুলবে। প্রশিক্ষণ ও অনুকূলীয় শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে মানব সম্পদ সৃষ্টিতেই ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের যেকোনো উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। প্রশিক্ষণ ও গ্রামোন্নয়নমূলক শিক্ষা মানুষের বিবিধ উপকার সাধন করতে সক্ষম-(১) কার্যকর মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে; (২) গ্রামোন্নয়নের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে; (৩) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে; (৪) সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে; (৫) উদ্ভাবনমূলক অনেক কিছুই সৃষ্টি হবে; (৬) জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে; (৭) গ্রামের মানুষের জাতিগঠনের মূলস্রোতের সঙ্গে অংশগ্রহণসহ সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে; (৮) সামাজিক দূরদৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হবে; (৯) সমাজের আধুনিকায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; (১০) মানুষের চিন্তা-চেতনায় ইতিবাচক পরিবেশ আনতে সক্ষম হবে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য যে শিক্ষার দরকার তা নিম্নরূপভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়- General Basic Education, Familly improvement Education, Community improvement education এবং Occupational Education. উল্লেখ্য, পল্লী উন্নয়নের জন্য যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা বিআরডিবি মাঠপর্যায়ে করতে সক্ষম বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত। কেননা বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনন্য একটি ব্র্যান্ড সংস্থা। মাঠপর্যায়ে তাদের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাও বিদ্যমান এবং এক্ষেত্রে তাদের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পও রয়েছে। বিআরডিবি তাদের এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে। তবে এগুলোর সবই একটি মাত্র অধিদপ্তরের আওতায় চালানো যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, গ্রামের মানুষকে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত রেখে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

মোঃ হুমায়ুন খালিদ, সরকারের সাবেক সচিব ও বিআরডিবি'র সাবেক মহাপরিচালক।

পল্লী উন্নয়নে একজন জুলিয়ান ফ্রান্সিস

ড. মিহির কান্তি মজুমদার

জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক জুলিয়ান হেনরি ফ্রান্সিস। ১৯৬০ এর দশকের শেষভাগে যুক্তরাজ্যের Merrist Wood Agriculture College এ কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতের বিহারে গান্ধী আশ্রমে একজন ভলানটিয়ার হিসেবে এ অঞ্চলে তার আগমন। বিহারের দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে ৩ বছর ভলানটিয়ারের সেবাধর্মী কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে OXFAM এর একজন কর্মী হিসাবে সংগ্রামী মানুষের সাথে কাজ শুরু করেন। ফলে প্রায় ৬ লক্ষ শরণার্থীর জন্য OXFAM এর খাদ্য, চিকিৎসা সামগ্রী ও অন্যান্য মানবিক সহযোগিতার কাজে তার অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে। বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নির্মম গণহত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচারের উদ্দেশ্যে OXFAM কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "Testimony of Sixty" নামক প্রকাশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের জবানবন্দিসহ মাদার তেরেসা, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, অ্যান্থনি মাসকারেনহাস এবং আরও অনেক খ্যাতি সম্পন্ন মানুষের বাণী ও বক্তব্য সম্বলিত এ প্রকাশনা একটি ঐতিহাসিক দলিল। মিঃ জুলিয়ান এ প্রকাশনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শরণার্থী শিবিরে কাজ করার পরে OXFAM এর প্রতিনিধি হিসেবে

গণভবনে এক অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ নাগরিক জুলিয়ান ফ্রান্সিস এর হাতে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সনদ তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে কাজ করার পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী তিনি ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি সড়ক পথে কলকাতা থেকে প্রথম দিন যশোর ও পরদিন ঢাকা আগমন করেন।

যুক্তরাজ্যে শিক্ষা জীবন শেষে বিহারের দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় একজন ভলানটিয়ার হিসেবে কাজ করা যৌবনদীপ্ত জুলিয়ান ১৯৭১ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থানকারী বাংলাদেশের শরণার্থীদের মধ্যে যখন কাজ শুরু করেন, তখন তার বয়স মাত্র ২৬। এ বয়সেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সুবিধা বঞ্চিত সংগ্রামী মানুষের সাথে কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে OXFAM এর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে আগমন করেন। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি একটি ল্যান্ড রোভার গাড়ি নিয়ে সড়ক পথে তার এ যাত্রা। সাথে কিছু ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী। অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে ঢাকা এসে প্রথমেই মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সাথে যোগাযোগ করেন। উদ্দেশ্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ। মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে কাজ করার সুবাদে প্রবাসী সরকারের উক্ত পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে তার পরিচিতিকেই এ কাজে ব্যবহার করেন। মি. জুলিয়ান ফ্রান্সিস তার বিভিন্ন লেখায় বঙ্গবন্ধুর সাথে তার স্বল্পসময়ের আবেগঘন সাক্ষাৎপর্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের জন্য OXFAM এর পক্ষে কী কাজ করতে পারেন তা প্রকাশ করায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "How did you come here, young man?"

মি : জুলিয়ান সড়ক পথে আসার বর্ণনা করায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন :

In that case, you have seen more of my country than I have, as I was a prisoner for over 9 months, so please tell me what you think my country needs. What did you see?"

মি : জুলিয়ান তখন ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণের জন্য OXFAM এর পক্ষ থেকে ২,৫০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং এর ঢেউটিন আনয়নের কার্যক্রমের কথা জানান এবং সেতু পুনঃনির্মাণসহ ফেরি সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব করেন। বঙ্গবন্ধু তখন বলেন :

"Ferries are and will be the lifelines for my people. Please discuss with the officials of Bangladesh Inland Water Authorities and see what OXFAM can do?"

সে প্রেক্ষাপটে OXFAM ৩টি ফেরি সরবরাহ করে এবং অন্যান্য কিছু ফেরি মেরামতসহ এ দেশের পুনর্গঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। মি. জুলিয়ানের প্রচেষ্টায় OXFAM কর্তৃক প্রদত্ত ফেরি 'কামিনী', 'কস্তুরী' এবং 'করবী' এখনও মাওয়া ও পাটুরিয়া ফেরিঘাটে পদ্মা নদীতে যানবাহন পারাপারে কাজ করছে ।

সুবিধা বঞ্চিত সংগ্রামী মানুষের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার কারণে OXFAM মি. জুলিয়ানকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে এরূপ কার্যক্রম পরিচালনায় নিযুক্ত করে। এরপর মি. জুলিয়ান ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকাসহ এ অঞ্চলের কুটিরশিল্প বিদেশে জনপ্রিয় করার জন্য OXFAM Trading এর সাথে কাজ করেন। পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, বন্যা কবলিত এলাকা, দুর্যোগ মোকাবেলা, পঙ্গু মানুষের পুণর্বাসন এ সম্পর্কিত কাজে তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, অ্যাকশন এইড প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিবেদিত ছিলেন এবং ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আদর্শ গ্রাম প্রকল্প ও ২০০৬ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত যমুনার চরাঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে CLP (Char Livelihoods Project) প্রকল্পের কার্যক্রমে মি. জুলিয়ান অনন্য অবদান রাখেন। ২০১২ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব থাকাকালে যমুনার চরাঞ্চলে CLP প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে মি. জুলিয়ানের সাথে আমার পরিচয় হয়। প্রায় ২৯ বছর বাংলাদেশের চরাঞ্চল, বন্যাকবলিত ও ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হই। যমুনার চরে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে CLP প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক মহোদয়ের কাছে পল্লী উন্নয়নে নিবেদিত এসব বিদেশি/দেশি ব্যক্তিবৃন্দকে সম্মান জানানোর জন্য "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক" প্রণয়নের প্রস্তাব করি এবং তিনি সানন্দে এ বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবেই "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক" প্রবর্তনের সূচনা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদয় অনুমোদনে বাস্তব লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধকালে এ দেশের জনগণের জন্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মি. জুলিয়ানকে সরকার ২০১২ সালে Friends of Liberation War Honour" সম্মানে ভূষিত করে এবং ২০১৮ সালে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় । বাংলাদেশে মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে সে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এওয়ার্ড OBE (Officer of the Order of the British Empire) সম্মানে ভূষিত করে। মি. জুলিয়ান বাংলাদেশের একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবে এদেশে বসবাস করছেন এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে কাজ করছেন। মি. জুলিয়ানসহ এদেশের পল্লী উন্নয়নে দেশি/বিদেশি যেসব স্বনামধন্য ব্যক্তি কাজ করেছেন ও করছেন , "জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক" এর মাধ্যমে তাদের কাজের স্বীকৃতি ও সম্মানিত করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এ প্রত্যাশা করছি।

ড. মিহির কান্তি মজুমদার : সাবেক সচিব

BRDB as a Rural Development Coordinator:

Thirty years experiences of Participatory Rural Development Project (PRDP)[1]

Dr. Akira Munakata

1. **Background**

The Government of Japan implements the Official Development Assistance (ODA) in developing countries and its main official implementation organization is Japan International Cooperation Agency (JICA). Rural development is one main focus of the Japanese ODA. This paper discusses experiences of Participatory Rural Development Project (PRDP), which has an integrated and multi sectoral approach.

2. **History of PRDP**

Development projects of JICA in Bangladesh are mainly implemented in sector-base with line departments which have technically specialized fields such as agriculture, health,

education, engineering etc. Local people's needs are, however, always multi facet which is beyond the limited mandate of a technically specialized line department. Therefore, it is difficult for technically specialized line departments to fully address local people's multi facet needs without effective coordination. In the 1980s, discussions on multi sectoral and people centered development was initiated in JICA as "participatory development". One example is the Participatory Rural Development Project (PRDP) in Bangladesh, where Comilla Model was implemented successfully aiming at "integrated rural development" before such discussions. PRDP was started as a joint action research project between academic institutions of Bangladesh and Kyoto University of Japan in 1985 and continued until 1997[2] Major findings of the joint research are: 1) Bangladesh has community mechanism at village level which can be utilized as a local development agent; 2) extension services by the public sector are critical and should be coordinated by a multi sectoral (non-technical) government organization in collaboration with Union Parishad UP; and 3) local level facilitators must be useful to disseminate and penetrate public services to local communities. Based on these findings, PRDP was implemented jointly by Bangladesh Rural Development Board (BRDP) and JICA. PRDP-1 was implemented in 4 unions from 2001 to 2005 and PRDP-2 was implemented in 20 union from 2006 to 2010 and expanded in 200 unions during the PRDP-2 extension periodfrom 2011 to 2015. Then, BRDB implements PRDP-3 in 600 unions from 2016. PRDP took more than thirty years to cover one-seventh of Bangladesh that has about 4,500 unions in total.

3. Salient feature and impact of PRDP.

PRDP has three major project components: 1) Village Development Committees (VDC); 2) Union Coordination Committees Meeting (UCCM); and 3) Union Development Officers (UDO). VDC is a village-based organization to identify and discuss various development issues of a village. VDC members are selected in a village general meeting by consensus of local citizens. Therefore, VDC members are selected regardless of their political party, religion, gender, age, family background etc. If a village general meeting is properly conducted, VDC members are fairly balanced in social status, and well accepted by villagers. With this well-balanced VDC membership, VDC can function as a development agency based on community mechanism. UCCM is a forum which consists of elected representatives (UP Chairman and Members), extension workers of line departments and NGOs (public service providers), and VDC Chairman (representative of public service receivers). Monthly UCCM is expected to discuss and find a solution of various development issues of a particular union by mobilizing public services of line departments/ NGOs and people's participation/ contribution.UCCM should be open forum, while Union Parishad meeting tends to be close door. The third component is Union Development Officers (UDO). UDO is a project staff working in a particular project union. UDO supports to hold UCCM, to organize VDC and hold regular VDC meetings. UDO also tries to ensure participation of line department staff in UCCM and VDC meetings. UDO facilitates the participation / contribution of community people in minor infrastructure sub-projects of PRDP. Combination of VDC, UCCM and UDO is called as "Link Model," which promotes coordinated public services to meet diversified local development needs.

With these three important components, PRDP is successfully implemented and brings positive changes in project unions.[3] Three major impacts of PRDP are: 1) Fair infrastructure development/no (less) corruption; 2) Coordinated public service delivery; and 3) Improved UP governance including trust among stakeholders. As a major project intervention of PRDP, minor infrastructure sub-projects are implemented with project support (80% of the total project cost) and community contribution (20%)[4]. As a result of PRDP-1 & PRDP-2, 27% of the total cost of minor infrastructure sub-projects was financed by voluntary contribution of benefited community. This result reveals that community people have a will to contribute to minor infrastructure sub-projects, if their benefit and participation are ensured. Moreover, local people feel no (less) corruptions in PRDP infrastructure sub-projects, since they have a chance to monitor the expenditure of a sub-project through VDC and UCCM. The second impact is the satisfactory level of public service delivery felt by local people, which is much higher in PRDP unions comparing with non-PRDP unions.[5] People's satisfaction in public service is an indispensable element of democratic local governance. It will bring a strong financial base of local governments through proper tax realization. The third impact is on the good governance of Union Parishad (UP). Open budget sessions are mandatory for all UP in the UP Act 2009. However, it is not practiced in many UPs. On the other hand, open budget sessions are conducted properly in all 20 UP of PRDP- 2 and majority of 600 UP of PRDP-3. Also, trust between UP Chairman/ Members and line department officials, local people's trust toward UP and line departments are higher in PRDP unions comparing with non- PRDP unions.[6] This is a proof of UP governance improvement realized by PRDP. Because of

these achievements, PRDP is well accepted and appreciated by both UP functionaries and local community.

In addition to these achievements, PRDP opens the window for BRBD to work closely with UP. Historically, BRDB work with cooperatives that majority of members are small-scale farmers. UP, on the other hand, should serve for all citizens in its geographical territory as a front-line local government institute (LGI). Proper working relation with LGI is important for BRDB which is expected to promote integrated rural development.

Wooden pool constructed by PRDP- 3, BRDB, Kaliakoir, Gazipur.

4. Limitations of PRDP

PRDP has brought about great impacts in project areas in the field of rural development and good local governance. However, it becomes also clear that PRDP has limitations to realize positive changes in all over the country. BRDB was established to implement integrated rural development in the 1980s. BRDB, however, gradually concentrates its activities into cooperative development through micro-credit provisions. Technical line departments like agriculture, health, education, engineering etc., on the other hand, expand their public services based on their national targets, which may not address specific local needs. Development partners also lost their interest in integrated rural development and put their development resources more in sector development with technically specialized line departments. Accordingly, public service delivery is sometime implemented without proper coordination, then its effectiveness and efficiency are not up to the mark. When PRDP was introduced, BRDB could revive its role as a rural development coordinator, but it is limited in the PRDP project area. Though BRDB has a mandated function to coordinate various rural development activities in the BRDB Ordinance/Act, it is difficult to play such roles outside PRDP project area in recent years. The shrinking role of BRDB is the first limitation of PRDP, even though the project proves that BRDB has a potential to play a role of rural development coordinator.

As being mentioned, PRDP has three major components: 1) VDC; 2) UCCM; and 3) UDO. Those important components are project-based setup but not regular setup of BRDB. Therefore, PRDP can be implemented only in the form of a project. This is the reason why PRDP spent so many years to expend its coverage from 4 unions to 20 unions, 200 unions and finally 600 unions in the form of PRDP Phase 1, 2 &3. BRDB will be a rural development coordinator only when a large scale project of PRDP will cover the entire country. There is a possibility to have such a huge project, but it may take longer years. These are fundamental limitations of PRDP of BRDB.

5. Institutionalization of PRDP in BRDB

Besides an idea to formulate a large scale project of PRDP, it is wise to have an alternate strategy to implement PRDP within the present framework of BRDB. It is difficult but not impossible. Three components of PRDP, i.e.,VDC, UCCM and UDO, can be realized by existing conditions of BRDB. Various and large number of village level organizations such as primary cooperative society are organized by BRDB. Therefore, BRDB can form new VDC through regular field activities, or existing village level organizations of BRDB can be functioned as VDC with proper guidance. UCCM can be replaced by the Union Development Coordination Committees (UDCC) meeting, which is mandated with a circular issued by the Local Government Division in 2011[7]. Expected functions of UCCM and UDCC are very similar, though details of two committees are slightly different such as composition, frequency, and member secretary of the committee. UDCC is one mandated Union Parishad (UP) function, but it is not fully realized yet.[8] Therefore, there is a chance to show the great potential of BRDB by materializing UDCC in all UP. Working with UP through UDCC will legitimate BRDB to be a rural development coordinator. Who will play the role of UDO is most challenging. Assistant Rural Development Officers (ARDO) is a feasible option. ARDO can start his/her career as an UDO. They should attend UDCC meeting of all UPs in

Field level training, PRDP- 3, BRDB

his/her assigned Upazila. Working experience as UDO, especially participation in UDCC meeting, will bring deep knowledge on functions of extension workers of technical line departments to newly recruited ARDO. They also can learn how to motivate community people, facilitate creative discussion in UDCC and VDC meetings, and coordinate with line departments and UP for integrated rural development. Such hand-on experiences and knowledge of ARDO will be an invaluable organizational asset for BRDB which is expected to play a role of rural development coordinator.

6. Conclusion

When cooperative movement got momentum and Comilla Model was successfully implemented as integrated rural development in Bangladesh, BRDB functioned as a rural development coordinator by facilitating public service delivery through cooperatives. However, as many cooperatives became inactive for various reasons and as technical line departments expand their activities, the role of BRDB as a rural development coordinator has been marginalized, and also integrated rural development lost the legitimacy. Now it is a time to revive the idea of integrated rural development by institutionalizing PRDP in BRDB[9], which can play a role of rural development coordinator in collaboration with LGI. Such attempts will bring prosperity in every rural community in the era when Bangladesh has been a middle-income country.

Dr. Akira Munakata: SeniorAdvisor, JICA.
munakata.akira@jica.go.jp

1. Akira Munakata, SeniorAdvisor, JICA. This paper is written with personal capacity of the author. Any point in the paper is not authorized by JICA and / or the Government of Japan. E- mail: Munakata. Akira@jica.go.jp
2. Bangladesh Agriculture University, Bangladesh Academy of Rural Development, Rural Development Academy in Bogra and BRDB were involved in the research.
3. Ex-post evaluation on PRDP-2 was conducted in 2014 to examine the impact of technical cooperation of JICA. A similar external evaluation on PRDP-3 should be organized to find out a way of sustainability.
4. Community contribution is come from two parties: benefitted villagers /VDC and UP. Major part is contribution from benefitted villagers /VDC.
5. Baseline Study (2005) and Impact Study of PRDP (2010) by PPRC.
6. Social Capital of PRDP (2010) by BARD, seminar paper of PRDP.
7. The idea of UDCC came from UCCM of PRDP.
8. Functional Status of UDCC Meeting: Nationwide Survey Evidence, by A. Jehad Sarker and A.K.M. Mizanur Rahman, NILG.
9. The Success of the Link Model Program in Rural Bangladesh: An Empirical Analysis, by Shutaro Takeda, Go Okui et al., (2018), Journal of Development Policy and Practice. The article examines the key success factor of Link Model in the beginning of PRDP-3. A final evaluation on PRDP-3 should be conducted to identify next challenges.

Rural Development and Local Governance

Experience of BRDB and the Sharique Local Governance Project

David Morlay

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) has been providing support to Helvetas Swiss Intercooperation to implement the Sharique project since 2006, with the aim of empowering local citizens to make and implement inclusive, gender sensitive and pro-poor collective choices about their lives and livelihoods through more democratic, transparent, inclusive and effective local governance systems in Bangladesh. The rationale is that good local governance leads to equitable local development for all members of society as they are encouraged to participate in decision-making processes. Sharique is based on the following impact hypothesis:

If citizens are empowered,

through effective and inclusive mechanisms for collective choice and collective action, and if local governments are strengthened, transparent, democratic, inclusive, and offer citizens the opportunity to engage in collective choice processes, then both quality and appropriateness of public services will improve.

There have been four phases of Sharique:

Phase I emphasised support to the supply side of local governance, in terms of capacity development and institutional strengthening.

Phase II added the objective to stimulate the demand for local governance, to encourage the supply side to improve performance. This followed findings from an evaluation of the first phase, which identified that the demand side needed to be trained to achieve the objectives of the programme.

Phase III introduced activity at the national level, and aims to influence policies and practices at national level through promoting and sharing its good practices and strengthening research initiatives.

Phase IV continued activity at the national level by piloting a 2-year model of demand and supply side training, with a focus on NILG coordinated and BRDB implemented UP training at the Upazilla level.

Sharique has sequentially increased its geographical coverage and the number of UPs it has supported since 2006. By the end of 2017, the programme was implementing activities across four districts and 207 UPs in Rajshahi, Sunamganj, Chapai Nawabanj and Khulna and directly affecting a population of over 900,000 citizens. Under Phase IV (2017-2020) Sharique reduced work in these four districts, and focused in all the UPs and wards of Gaibandha and Barisal.

Sharique has focused on implementing good governance principles to support Bangladesh's democratisation agenda and implement its existing legal framework. These are:

Accountability: building oversight, answerability and enforcement into local decision-making horizontally between different decision-makers and vertically between citizens and decision-makers of the governance system.

Participation: UPs share information with citizens and ensure that everyone has an opportunity to speak and be heard.

Transparency: making sure that relevant information is available to citizens such as income and expenditure figures of the local government, information on projects, and beneficiary lists.

Social Inclusion: actively ensuring that the voice of all members of society is heard and can take part in decision-making.

Efficiency and Effectiveness: ensuring that UP operations are performed smoothly and promptly, without waste or corruption.

The programme has focused on developing awareness of these principles as well as establishing structures that enable exchange between citizens and UPs.

Developing the capacities of local governments and empowering citizens has been the overarching mode of intervention for Sharique and has been essential in putting good governance principles into practice. Interactive training sessions followed by accompaniment and technical follow-up support has been central to this capacity-building approach. This has involved delivering training sessions at a time that is conducive to the planning and budgeting cycle while also providing tailor-made support to UP chairpersons, members and secretaries to tackle new challenges as they arise during the performance of their political responsibilities.

Results and Learnings from Sharique

An impact evaluation of Sharique Phases I-III showed how Sharique supported sustainable change in Bangladesh's local governance system. The following section highlights the impacts of the programme:

Sustaining Collective Decision-Making

As a pre-condition for good governance, collective decision-making provides an opportunity for all citizens and local governments to decide and prioritise on local issues. It also initiates transparent and inclusive decision-making and enables the possibility to hold others to account. Initiating a collective approach to decision- making, Sharique aimed to raise awareness and capacities on roles, duties and responsibilities and support the development and operationalisation of such collective decision-making spaces, namely the Ward Shava and Open Budget Meetings, which were either not previously organised or rarely occurred.

The establishment of ward platforms has been particularly important for effectively bringing together a specific group of community members with the local government to decide on pertinent issues collectively. The ward platforms consist of a range of community members from different social and economic backgrounds who are committed to representing the interests of the poorest and most marginalised members of the community. In some UPs, the ward platforms now play an active role in selecting and prioritising projects and identifying beneficiaries to receive benefits from the Social Safety Net programme.

Developing a Tax- paying Culture

Taxation is not just important for raising revenue, it also serves as a

catalyst for more responsive and accountable governments. Tax serves as a binding link between UPs and its citizens by encouraging dialogue and accountability between the two.

Sharique showed how the establishment of a consistent tax-paying culture across the UPs, evidenced by a stronger tax collection effort on behalf of the UPs and a larger proportion of citizens paying taxes can increase the revenue for the UPs to effectively deliver services and support local development projects. Tax paying has also inspired a sense of ownership by citizens, motivating citizens further to take part in local decision- making.

Some UP chairpersons, rather than fearing that taxation would reduce their popularity, preferred the deeper citizen engagement that it instigated. It was noted that tax paying supports citizens in gaining a more realistic understanding of resources available to the UP and the limitations UPs face in service delivery.

Including Marginalised Groups in Decision-Making

Including marginalised voices in local decision-making ensures service provision is responsive to a wide spectrum of social groups. Sharique has focused on groups least likely to have a voice - including women, Adivasi, members of fishing communities and disabled people - and, through training, empowered them to speak up and raise their opinions and voice their demands.

Citizens have access to more inclusive mechanisms for collective choice and action, and citizens from different social statuses can access information and participate in decision-making. It was also noted, however, that the poorest and most marginalised continue to face barriers to equal access and participation in collective decision-making spaces.

The training provided had also initiated a change in attitudes and especially an increase in respect towards women and vulnerable groups and a lower acceptance of child marriages.

Sharique Phase IV

Under Phase IV, Sharique piloted BRDB led Subject Specific Training to UP Chairmen and Secretaries through a Sharique/NILG decentralized training approach. The Subject Specific Training drew on the expertise and resources of BRDB District and Upazilla staff allowing the training to be decentralised and delivered at the Upazilla level. BRDB were selected as the best government organisation to carry out this work because of their networks at the UPZ level, and extensive experience on rural development. The UP training led to a collaborative mode of working between BRDB and NILG, and brought in subject specific expertise from IPF and NAPD both for course development and training quality assurance.

Working in Gaibandha and Barisal Districts, BRDB staffs received ToT from NILG and then BRDB led on the organisation and delivery of training to UP Secretaries, UP Chairmen, and other elected UP members. Over the course of two years, and fitting in with the UP annual planning cycle, BRDB delivered multi-day courses on led on training on topics as diverse as 5-Year Planning, Public Finance Management, and Ward Shava and Open Budget Meetings. Senior District and Head Office BRDB staff supported the training through quality assurance visits. Importantly, BRDB became a knowledgeable local resource on UP governance, and were also able to provide continued backstopping technical advice to UPs after the training. This helped to further embed learning outcomes.

Capacity building of UPs under this programme contributed to improved coordinated service delivery by the UP to rural citizens, and also to improved rural development through better planning, and implementation of development initiatives. There have also been improvements in the capacity of Union Parishads for budget management, and a more citizen focussed service delivery.

Sharique Phase IV has shown that BRDB led decentralised training is an effective way of extending NILG's reach, by delivering high quality participative training to UP Chairmen and Secretaries.

Conclusions

Sharique was intended to be a temporary actor facilitating change by empowering citizens and strengthening local government. Evidence from the impact assessment of Phases I-III and learnings under Phase IV show that:

- a government led decentralised training programme focused on enhancing core local government functions alongside a programme of citizens training can bring about improvements in UP governance;
- the relationship between citizens and UPs can be strengthened; and
- that pro- poor UP decision making can be more effective.

Importantly, strong coordination between government agencies at central, district and Upazilla level that brings together the individual strengths of each agency is the key to developing a strong partnership that can support UP governance improvements.

David Morley: Senior Team Leader, Sharique Phase IV (2017-2021), Helvetas Swiss Intercooperation.

সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি : কিছু প্রত্যাশার রূপরেখা

ড. মোঃ হাম্মাদুর রহমান

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন আর সমবায় আন্দোলনের সাথে বিআরডিবির নাম একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর তৎকালীন পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে ভিলেজ এইড বা ভি-এইড প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয় যেখানে সাতটি মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। পল্লী উন্নয়নের জন্য এটি ছিল একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। ১৯৬১ সালে ভি-এইড প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ীতে পূর্ব পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আজকের বার্ড) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভিশনারি গ্রাম-উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ড. আখতার হামিদ খানের উদ্ভাবিত বিশ্ববিখ্যাত কুমিল্লা মডেলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এদেশে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা হয়। কুমিল্লা মডেলের দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করার জন্য ১৯৭০-'৭১ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)

চালু করা হয়। পরবর্তীতে আইআরডিপির সাফল্যকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সদ্যস্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে একে সম্প্রসারিত করা হয়। আইআরডিপির সফলতার কারণে একে সাংগঠনিক রূপদানের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশবলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবিতে রূপান্তরিত করা হয়।

পল্লী উন্নয়নে দ্বিস্তর সমবায়সহ (গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতি ও থানা পর্যায়ে থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি যা বর্তমানে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি) কুমিল্লা মডেলের উপাদানগুলোর (রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন, থানা সেচ কর্মসূচি) সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বিআরডিবি এদেশে পল্লী উন্নয়নে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। আইআরডিপির সীমাবদ্ধতাগুলোকে বিবেচনা করে পরবর্তীতে বিআরডিবি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে গ্রামের জনগণের নিকট একটি আস্থার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

সমবায়ভিত্তিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের ধারণাকে মূলমন্ত্র করেই বিআরডিবি যাত্রা শুরু করেছিল। এর কার্যক্রমকে জোরদারকরণের লক্ষ্যে অনেকগুলো প্রকল্প ও কর্মসূচি বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন আছে, যার ফলে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নয়ন হয়েছে এবং গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবির এ অবদান প্রশংসনীয়। বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিআরডিবি তার ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জনবলের অভাব, অপর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ ও নানাবিধ রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপের মুখে যদিও কোনো কোনো সময় উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়, তবুও বিআরডিবি গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে সরকারের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিআরডিবির কাজের সফলতা ও ব্যর্থতার অনেক মূল্যায়ন হয়েছে। এর বিশাল পরিসর বিবেচনা করে বর্তমান নিবন্ধে কেবলমাত্র সমবায় সমিতিকেন্দ্রিক কার্যক্রমকে নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলোর মৌলিক দুর্বলতা

এ কথা সত্য যে দ্বিস্তর সমবায়ের অভিনব ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমেই বিআরডিবি এদেশে সমবায় আন্দোলনের ভিত তৈরি করেছে। তবে সময়ের সাথে সাথে একদিকে যেমন বিআরডিবি অনেকগুলো বড় কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, তেমনি এসব কর্মসূচির আওতায় সমবায় সমিতিগুলোকে কার্যকর ও জোরদার করে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। ফলে সমবায় সমিতিগুলো এখন অনেকটাই কার্যকারিতা হারিয়েছে। আমার দৃষ্টিতে সমবায় সমিতিগুলোর প্রধান দূর্বলতাগুলো নিম্নরূপ :

(১) বিআরডিবির সমবায় সমিতিগুলোতে প্রকৃত সমবায়ী নেতৃত্ব না থাকা;
(২) সমবায় সমিতিগুলোকে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য সমবায়বান্ধব কর্মসূচি না থাকা;
(৩) প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলোর উপযুক্ত এক্সিট স্ট্র্যাটেজি না থাকায় প্রকল্প শেষ হওয়ার পরই জনবলের বেতন-ভাতার সমস্যার কারণে এগুলোর কার্যক্রম স্থবিরতা এবং

পাঁচকাহনীয়া কৃষক সমবায় সমিতি, বিআরডিবি, টাঙ্গাইল

যথাযথ মনিটরিং এর অভাব;
(৪) বিআরডিবিতে সমবায় কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে ঋণ কার্যক্রমকে বেশি গুরুত্ব দেয়া;
(৫) সমবায়কে জোরদার করার মতো দক্ষ ও বিশেষায়িত মানবশক্তি নেতৃত্বে না আনা;
(৬) ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক এনজিও'র বিকল্প হিসেবে আবির্ভাবের চেষ্টা;
(৭) অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে একযোগে কাজ করতে গিয়ে সমন্বয়ের অভাবে যুগপৎ কর্মসূচি হাতে নেয়া যা অর্থ ও মানব সম্পদের অপচয় বাড়িয়ে দিয়েছে; এবং
(৮) সমবায় ও বিআরডিবির কার্যক্রমে সাফল্য-ব্যর্থতার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য গবেষণাভিত্তিক কর্মসূচির অভাব।

কার্যকরী সমবায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু রূপরেখা

আগামী দিনে সমবায় আন্দোলনকে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নের সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু প্রস্তাবনা এখানে দেয়া হলো। এরকম আরও প্রস্তাবনার ধারণা হয়তো বিআরডিবির বিবেচনায় আছে। বিআরডিবির ওপর একজন গবেষক হিসেবে লিখার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এর সাফল্য ব্যর্থতার মূল্যায়ন নিয়ে খুব বেশি বিশ্লেষণ একাডেমিক গবেষণাপত্র পাওয়া যায় না। তবু কর্তৃপক্ষ নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারেন :

(১) সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থায় কৃষকদের কার্যকরী অংশগ্রহণ

এটি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলেও কোনো ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন বাস্তবে দেখা যায় না, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে সরকারের সহায়ক নীতি, গবেষণা ও সম্প্রসারণে উপযুক্ত বিনিয়োগ এবং কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতার কারণে কৃষি উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বেড়েছে যার ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে সরকারের যথাযথ গুরুত্ব আরোপের কারণে বাংলাদেশের কৃষক ও খামারীরা এই বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। একইসাথে গ্রামে কৃষি সংশ্লিষ্ট ও বিভিন্ন অকৃষি সেক্টরে বিকাশের ফলে পল্লীর জনগণের বছরব্যাপী কর্মসংস্থান ও খানাপর্যায়ে (household level) খাদ্য নিরাপত্তা বেড়েছে। তবে উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার ব্যবস্থার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় প্রকৃত কৃষক ও খামারিদের কৃষিপণ্যের দাম প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তাও বেড়েছে। আগাম শীতকালীন শাকসবজি, ডেইরি, পোলট্রি ইত্যাদি উৎপাদনে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি ও খামারিদের প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় যার একটা বড় অংশ আসে ঋণ থেকে। পণ্যের দাম প্রায়শই কমে যাওয়ার কারণে এসব কৃষক ও খামারিরা অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজি হারিয়ে বিশালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সমবায়ভিত্তিক বাজারব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে চাষিদের এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

পূর্ব এশিয়াতে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান সমবায়ভিত্তিতে কৃষিপণ্য ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন চাহিদা ও পণ্য উৎপাদনের বিষয়ে কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে, আবার সমন্বিতভাবে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়ানুগ বাজারমূল্য পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করছে। এসব দেশে সমবায়ের আওতাধীন চাষি বা উৎপাদকেরা সরাসরি নিজেরা কোনো পণ্য বাজারজাত না করে সমবায় সমিতিগুলোর নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে উপযুক্ত মূল্যে মার্কেট অ্যাক্টরদের কাছে সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে সমিতিগুলো সদস্যদের আস্থা অর্জন করে ও কার্যকরী সমবায় সমিতি হিসেবে কাজ করতে পারে। বিআরডিবি এক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে সমবায় আন্দোলনে নতুন জোয়ার শুরু করতে পারে। বিআরডিবির সমবায় সংগঠনে বিশাল অভিজ্ঞতা এর সাফল্য এনে দেবে যা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো করতে পারছে না।

(২) নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কৃষক সমবায় সমিতির ভূমিকা

বিষয়টি পরিষ্কার করার আগে ইউরোপে পরিবেশসম্মত জৈব কৃষি বা অরগানিক ফার্মিং আন্দোলনের দিকে তাকাই। ১৯২০ এর দশকে ইউরোপে শুরু হওয়া জৈব কৃষির মূলভিত্তি ছিল কৃষকদের সংগঠন। যেহেতু উচ্চ ফলনের আধুনিক কৃষি বিকল্প হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম ফলনের কিন্তু মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব জৈব কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ছিল বেশি, তাই এই পণ্যের জন্য বিশেষ মূল্য বা প্রিমিয়াম মূল্য ছাড়া এটাকে বাণিজ্যিকভাবে টিকিয়ে রাখা যাবে না বলে তখনকার কৃষকেরা বুঝতে পেরেছিলেন। অপরদিকে জৈব কৃষিপণ্যের মূল্য ভোক্তারা তখনই পরিশোধ করতে প্রস্তুত ছিল যখন এটির উৎপাদন ব্যবস্থা কোনো ধরনের প্রতারণামুক্ত হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে। কাজেই পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও বেশি মূল্য নিশ্চিতকরণের বিষয়টি কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে সমাধান করে সফল হন। যেমন, জৈব কৃষির আওতার সমবায়ী চাষিরা প্রথমে পণ্য উৎপাদনের স্বীকৃত ও বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা বা গাইডলাইন তৈরি করে সম্প্রসারণ সংস্থাগুলো থেকে প্রযুক্তিগত পরামর্শক (মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী) নিয়োগ করে। মূল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রথমে সবাই একই রকম ফসল না ফলিয়ে নিজেদের পণ্য নিজেদের নিকট এবং পুরো প্রক্রিয়াটি নিজের চোখে দেখা উৎসাহী প্রতিবেশীদের মধ্যে বিক্রি করা শুরু করে। পরবর্তীতে উৎপাদনকারী ও শহুরে ভোগকারীদের চুক্তি অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা হতো। প্রথমদিকে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সমবায়ের সদস্যরা একে অপরকে পর্যবেক্ষণে রাখত ও সংশ্লিষ্ট চুক্তিভিত্তিক সম্প্রসারণ সংস্থার কর্মীদের নিকট থেকে নিশ্চয়তাপত্র গ্রহণ করার পরই কেবলমাত্র পণ্য বাজারজাত করতে পারত। ক্রমে অরগানিক পণ্যের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় সমিতিভিত্তিক পণ্যের সার্টিফিকেশন শুরু হয় এবং সেটা সুপারমার্কেটসহ সমস্ত মার্কেট চ্যানেলেই জনপ্রিয় হয়। ক্রমে এ সার্টিফিকেশনকে কেন্দ্র করে সমবায় জৈব কৃষির সমিতিসমূহের ফেডারেশন গড়ে ওঠে যারা জাতীয়ভাবে পণ্যের মান, বাজারমূল্য, সরকারি পলিসি ও প্রণোদনা সহায়তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করা শুরু করে। এভাবেই ডিমিটার, বায়োল্যান্ড, বায়োপার্ক, বায়ো-সিগেলের মতো বিশ্বখ্যাত অরগানিক ব্র্যান্ডগুলো তৈরি হয়। এখন আসি বাংলাদেশে। আমাদের দেশে অনেকে নানা মোড়কে নিরাপদ খাদ্য এমনকি অরগানিক খাদ্য উৎপাদন করা সত্ত্বেও কার্যকরী সমবায়ভিত্তিক সাধারণ গাইডলাইন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সার্টিফিকেশনের অভাবে কোনো বিশ্বাসযোগ্য বাজার তৈরি করতে পারছে না। অথচ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিআরডিবি সমবায় সমিতিভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য ও অরগানিক পণ্য বাজারজাতকরণে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৩) প্রান্তিক ও বর্গাচাষি উন্নয়ন

একসময় বিআরডিবি'র আওতায় বিত্তহীন সমবায় সমিতি ও বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল। সে সময় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ সমিতিগুলো কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এখন এ সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রম আগের মতো প্রাণবন্ত নেই। তবে, বিআরডিবি সমবায় কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় গঠিত পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রেখে যাচ্ছে। কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে এ সমিতি/দলগুলোর মাধ্যমে কৃষকগণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে কৃষির অগ্রগতিতে

মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সমবায়ী কৃষকদের পরামর্শ প্রদান, বিআরডিবি, সুনামগঞ্জ।

এ কৃষকদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো বর্তমানে শহরমুখী ও কৃষিতে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা বড় আকারের জমির মালিকদের অনুপস্থিতিতে তাদের জমি ব্যবহারে কৃষি উৎপাদন সচল রাখা। কৃষকদের সংগঠিত করা গেলে জমির মালিকদের সাথে ন্যায়সংগত সমঝোতা করা ও প্রকৃত দরিদ্র চাষিদের কাছে সরকারি প্রণোদনা পৌঁছে দেয়া যাবে।

(৪) কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ অধিক পুঁজির ব্যবসার জন্য সমবায়ের ব্যবহার

বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষির আধুনিকীকরণের যুগে প্রবেশ করেছে। কৃষির আধুনিকীকরণের একটি বড় নির্ণায়ক হলো এতে উৎপাদন পর্যায়ে বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ। যেমন একটি ভালো মানের কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের বাজারমূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। ব্যবহার সহজ হওয়া এবং অনেকগুলো কাজ একসাথে করার ফলে উচ্চ দক্ষতার কারণে দ্রুত ফসল কাটার যন্ত্র হিসেবে এটার বিপুল চাহিদা রয়েছে। তবে উচ্চমূল্যের কারণে এটি সাধারণ কৃষকদের নাগালের বাইরে হওয়াতে সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দেয়া হলেও কৃষকপর্যায়ে ব্যবহার বাড়ছে না। অথচ মাড়াই মৌসুমে কৃষকদেরকে ভাড়া হিসেবে এটি ফসল কাটায় ব্যবহার করলে অল্প সময়ে যেমন বেশি ফসল কাটা যাবে, তেমনি শ্রমিক অপ্রাপ্যতা ও উচ্চ শ্রমিকমূল্যের সমস্যাও সমাধান করা যাবে। বিআরডিবি তার গ্রাম পর্যায়ে সফল সমবায় সমিতিগুলোকে কৃষি যন্ত্রপাতির হাবে পরিণত করতে পারে। খুব সহজেই সমবায় সমিতিগুলোকে ব্যবসা মডেলে নিয়ে এসে একদিকে যেমন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে জনপ্রিয় করা যাবে, অন্যদিকে সমবায় সমিতিগুলোকে কৃষি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। একটু উদ্যোগ নিলেই বিআরডিবির বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতিকে এ লাভজনক ব্যবসায় নিয়ে আসা যাবে।

(৫) বিআরডিবি ও সমবায় নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সহযোগিতা

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনে বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য থাকলেও বিষয়টি নিয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল খুব একটা দেখা যায় না। অথচ বর্তমান যুগকে বলা হচ্ছে ইনফরমেশন ডিকেড বা তথ্য দশক, যেখানে এরকম তথ্য ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে ত্রুটিমুক্ত ও দক্ষ করতে সাহায্য করে। যেহেতু বিআরডিবি পল্লী এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে আর বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষি, কাজেই বিআরডিবি'র বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতার সঠিক মূল্যায়নের জন্য এসব কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের মোট বাজেটের অতিসামান্য অর্থ (১-২%) গবেষণার জন্য বরাদ্দ থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স ও পি-এইচডি) গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বিভিন্ন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে বেছে নিতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন সহযোগিতামূলক গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বিআরডিবির যোগসূত্র তৈরি হবে, একইসাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষকদের গবেষণা প্রকাশনা হিসেবেও বিআরডিবির সাফল্য ও অবদান সম্পর্কে একাডেমিক ডকুমেন্টেশন হবে যা বিআরডিবির ভাবমূর্তিকে বাড়িয়ে দিবে। বর্তমানে কৃষিতে (কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য) বিশ্বব্যাংকের একটি বড় প্রকল্প ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রামের (এনএটিপি) অর্থায়নে এরকম গবেষণা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিচালিত হচ্ছে যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর গবেষক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন এদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বিস্ময়কর সফলতা লাভ করে চলেছে তার সাথে তালমিলিয়ে বিআরডিবিও সমবায় আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার গর্বিত সহযোগী হবে এটিই আগামীর প্রত্যাশা। এদেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মানবশক্তি ও গবেষণার সূতিকাগার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিআরডিবির ভবিষ্যৎ সাফল্যের অংশীদার হতে পারলেই আমার লেখাটি সার্থক হবে বলে আশা করছি।

ড. মোঃ হাম্মাদুর রহমান, অধ্যাপক, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ক্ষুদ্র ঋণ ও বিআরডিবি

ড. মুহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি প্রধান কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে যদিও এটির কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এমনকি যারা ক্ষুদ্র ঋণের একনিষ্ঠ সমর্থক যেমন বিশ্বব্যাংক, ডিএফআইডি এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে এবং এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার ওপর জোর দিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে, এত বিতর্ক সত্ত্বেও এসডিজি এর প্রধান লক্ষ্য 'শূন্য দারিদ্র্য' এর অন্যতম কৌশল হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এ কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ঋণ অনেকটা 'কৈ' এর তেলে কৈ ভাজা'র মতো। এটি হচ্ছে নব্যউদারনৈতিক ব্যবস্থার একটি কৌশল যেখানে দরিদ্র এবং দরিদ্রদের নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার হচ্ছে এটির অন্যতম নীতি। এ ব্যবস্থায় দরিদ্রদের দুরবস্থার জন্য তাদের নিজেদেরকেই দায়ী করা হয়। যদিও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থা যে এ দুরবস্থার জন্য দায়ী সে বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এখানে দরিদ্রদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয় এবং ক্ষুদ্র ঋণ

হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পুঁজিবাদী শোষণের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে প্রান্তের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি একসময় এ পুঁজিবাদের আওতার বাইরে ছিল।

ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা হচ্ছে, দরিদ্রদের পুঁজির অভাব রয়েছে এবং তাদেরকে যদি পুঁজি সরবরাহ করা যায় তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে সক্ষম। বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ রূপান্তরিত হয়েছে ক্ষুদ্র অর্থায়নে যেখানে ক্ষুদ্র ঋণের সাথে অন্যান্য আরও উপাদান যুক্ত করা হয়েছে, যেমন- প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রম ইত্যাদি। তবে বেশির ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যক্রম ঋণ প্রদান ও আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে জড়িত বিভিন্ন এনজিওগুলো এখন ক্ষুদ্র ঋণ থেকে সরে এসে এসএমই ঋণ দিয়ে থাকে। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, ক্ষুদ্র ঋণ আর ক্ষুদ্র ঋণের মধ্যে নেই। এটি এখন মুনাফামুখী সামাজিক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য গৌণ হয়ে পড়েছে।

যে সকল স্বনামধন্য পণ্ডিত উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন যেমন - নোবেল বিজয়ী দার্শনিক ও অর্থনীতিবীদ অমর্ত্যসেন, যিনি তার সক্ষমতার দৃষ্টিকোণ (Capability approach) এ বলেছেন উন্নয়ন হচ্ছে 'স্বাধীনতা' (development as freedom) এবং এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি সক্ষমতা অর্জনের কথা বলেছেন। এ সক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি যে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন সেটা হচ্ছে প্রকৃত সুযোগ (actual opportunity) সৃষ্টি। এছাড়াও তিনি সক্ষমতা অর্জনের পথে যে সকল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা (social constraints) রয়েছে সেগুলো দূরীকরণের কথা বলেছেন, যেমন- কুসংস্কার, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি। তাছাড়া সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি সুযোগ সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকও হতে পারে। সেজন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান সুযোগ সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে সেগুলোও দূরীকরণের কথা বলেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষুদ্র ঋণ কি আসলেই প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্রদের সক্ষমতা অর্জনে সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পারে? আমার পিএইচডি গবেষণা অনুসন্ধানের অন্যতম বিষয় ছিল, এ প্রশ্নের উত্তর বের করে নিয়ে আসা। এরই অংশ হিসেবে আমি বিআরডিবি'র বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও দলের উপকারভোগী এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে আলাপ আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হই; যার কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি।

প্রথমত, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এমনভাবে সংগঠিত করা হয়েছে, সেখানে যারা মাঠকর্মী তাদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায় ঋণ প্রদান ও আদায় করা এবং এর মানে অন্যান্য যে বিষয়গুলো থাকে, যেমন-প্রকৃত দরিদ্রদের উপকারভোগী হিসেবে চিহ্নিত ও অন্তর্ভুক্ত করা, যারা ঋণ নিয়েছেন তারা কীভাবে সেটা ব্যবহার বা বিনিয়োগ করছেন- সেগুলো গৌণ হয়ে পড়ে। কারণ ঋণ আদায়ের সাথে তাদের মাসিক বেতনের যোগসূত্র রয়েছে। যে কারণে তারা ঋণ প্রদান ও কিস্তি আদায়ের উপর জোর দেন। তাছাড়া মাঠকর্মীকে ঋণ প্রদানের ও আদায়ের নির্দিষ্ট টার্গেট দেয়া হয়। এ টার্গেট পূরণ করতে গিয়ে ঋণ নিয়ে একজন উপকারভোগী কী করছেন? তার অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে কি না? সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার সময় কিংবা স্পৃহা থাকে না। ফলে যারা ক্ষুদ্র ঋণের প্রধান লক্ষ্য 'দরিদ্ররা' এর আওতার বাইরে চলে যান। এখানে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কার কিস্তি পরিশোধের সামর্থ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে একজন কর্মকর্তা দুঃখ করে বলেন, "আমরা মানুষকে মহাজনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেরাই মহাজনে পরিণত হয়েছি"।

দ্বিতীয়ত, ঋণ সকল উপকারভোগীকে একসাথে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই পরিমাণে প্রদান করা হয়। ফলে দেখা যায় একজন উপকারভোগী যখন প্রয়োজন তখন ঋণ পান না। আবার তার যে পরিমাণ ঋণ প্রয়োজন সেটিও পান না। সেজন্য দেখা যায়, একজন উপকারভোগী বছরের পর বছর ঋণ নিলেও তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। বরং তিনি ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ঋণের অন্যতম উপাদান হচ্ছে সঞ্চয়। সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকারভোগীদের মূলধন গঠন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অনেক উপকারভোগী কিস্তির শেষ পর্যায়ে এ সঞ্চয় দিয়ে ঋণ সমন্বয় করে থাকেন এবং ঋণ প্রদানকারী সঞ্চয়কে অনেকটা জামানত হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও বলা হয়ে থাকে, 'ক্ষুদ্র ঋণ হচ্ছে জামানতমুক্ত'। কোনো গ্রুপের কোনো সদস্য কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে তখন গ্রুপের অন্য নিয়মিত সদস্যরা আর ঋণ পান না। ফলে সমবায় সমিতি বা দল অকার্যকর হয়ে পড়ে। আবার নিয়মিত সদস্যরা নতুন সমিতি বা দল যদি গঠন করেন তখন তাদের প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। ফলে সমিতি চালু থাকলেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর তারা যে পরিমাণ ঋণ পাওয়ার কথা সেটিও পাননা। তাই তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা দেখা দেয়।

দারিদ্র্যতামুক্ত হওয়ার জন্য অমর্ত্যসেনের দর্শন দরিদ্রদের জন্য সত্যিকারের সুযোগ এবং সক্ষমতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু দরিদ্রতার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা দায়ী, সেজন্য রাষ্ট্রকে দরিদ্রদের দায়িত্ব নিতে হবে। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য প্রকৃত সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

দরিদ্রদের যেমন পুঁজি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাদের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ ও সেবা যাতে করে তাদেরকে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সম্পদে, এককথায় যে বিষয়গুলো দরিদ্রদের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে, সে বিষয়গুলোতে পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি পল্লীভিত্তিক বাংলাদেশে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে, কমিউনিটি ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্রদের চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে মৌলিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। উপজেলা পর্যায়ে যে সকল সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়নমূলক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিআরবিডিবি'র মাধ্যমে সেগুলোর সমন্বয় এবং সেবাসমূহ দরিদ্রদের নিকট পৌঁছে দেয়া। দরিদ্ররা যাতে করে ঋণ নিয়ে খরচ না করে বিনিয়োগ করে সেজন্য তাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা এবং তাদের বাচ্চাদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ঋণ নিয়ে অসুস্থতার চিকিৎসা কিংবা বাচ্চাদের পড়াশুনার খরচ এমনকি বিয়ের খরচ মেটানো হয়। মোটকথা, দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য তাদের কথা শুনতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনের আলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে, উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থা নয়।

কৃতজ্ঞতা : অনুসন্ধানে সহযোগিতার জন্য বিআরডিবি'র সকল উপকারভোগী ও কর্মকর্তা কর্মচারীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

ড. মুহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক লোকপ্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

পল্লী উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণ : কোভিড-ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি মানবিক উদ্যোগ

মোঃ সাজেদুল ইসলাম

ভূমিকা

'এসেছে পল্লীর শুভদিন, বিআরডিবি দিচ্ছে এসএমই ঋণ'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় স্বল্প সুদে দেশব্যাপী বিআরডিবি'র মাধ্যমে উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিডজনিত অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ সকল উদ্যোগের আওতায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে লক্ষ্য করে বিআরডিবি'র অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণোদনাস্বরূপ বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম ধাপে ১৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। ছাড়কৃত অর্থ বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লীর ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহজ শর্তে প্রণোদনাস্বরূপ ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ বিনিয়োগ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা,

বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রমের সাথে এর সংগতি রক্ষা এবং এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআরডিবি কর্তৃক 'কোভিড-১৯ প্রণোদনা : পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়।

কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে পল্লী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির সফল উত্তরণ, পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে প্রণীত নীতিমালার আওতায় পরিচালিত 'পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ' বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। একইসাথে দরিদ্র জনগণকে আয় উৎসারী দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী উদ্যোক্তাসহ সকল ধরনের উদ্যোক্তা উদ্দীপনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের লক্ষ্য

উদ্যোক্তা ঋণের লক্ষ্য হলোো করোনা মহামারির অভিঘাতে সরকারের অবিরাম উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পল্লী অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প খাতে চলমান সংকট লাঘবে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত মজুরি বজায় রেখে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

উদ্দেশ্য

বিআরডিবি'র সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে :

(১) করোনা মহামারির অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগসমূহকে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে পুনর্বাসিত করে উৎপাদনক্ষম স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছাতে সহায়তা করা;

(২) বাংলাদেশের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের ওপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে অভীষ্ট প্রকৃত মজুরি ও বর্ধিত আয় অর্জনে সহায়তা করা;

(৩) বিআরডিবি'র সুবিধাভোগী সদস্য যারা আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে প্রান্তিক অবস্থান থেকে পল্লী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে কিছুটা সফল হয়েছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে পল্লী উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার মতো সম্ভাবনাময় অবস্থানে আছেন তাদের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা;

(৪) গ্রামীণ পর্যায়ে শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা;

৫) সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পল্লী বিপণির মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

৬) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা;

৭) সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের আলোকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা।

সুফলভোগী জনগোষ্ঠী

স্থানীয় সম্পদ ও নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে কিংবা বিআরডিবি'র আওতায় ঘূর্ণায়মান ঋণ কর্মসূচির উপকরণ, যেমন- ঋণ, প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা, সেবা, সরবরাহ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে যে সকল সদস্য দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এবং পরিবারের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন,

কোভিড ১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের চেক প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

তাকে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে এসএমই ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য সুফলভোগী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি সমগ্র বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯৪টি উপজেলায় কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

বিভিন্ন প্রকারের পল্লী উদ্যোক্তা

কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) ক্যাটাগরির সুফলভোগীকে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হবে-

১) বিআরডিবি'র প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সৃষ্ট প্রি-গ্র্যাজুয়েট/গ্র্যাজুয়েট/পল্লী উদ্যোক্তা : বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় যে সকল সদস্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সামগ্রিকভাবে সে সমস্ত সদস্যকে বুঝাবে। যেমন-

প্রি-গ্র্যাজুয়েট : যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্যভাবে আয় বৃদ্ধি করতে এবং মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে পরিবার প্রতিপালন করার সামর্থ্য বা সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে প্রি-গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

গ্র্যাজুয়েট : যে সদস্য তার দক্ষতা এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

২) স্বাবলম্বী পল্লী উদ্যোক্তা সমবায়ী/সমবায় সমিতি/অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্য :

বিআরডিবি'র আওতায় গঠিত প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য যারা আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেরা সফল হয়েছেন এবং যাদের কর্মকাণ্ডে অধিক ঋণ বিনিয়োগ করলে আরও আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে তাদেরকে বুঝাবে।

বিআরডিবিভুক্ত সমিতি/দলের সদস্য যারা বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখন পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের সামর্থ্য বা যোগ্যতা অর্জন করেননি কিন্তু এরূপ সামর্থ্য বা যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাদের এই নীতিমালার অধীনে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত) ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণে এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

৩) পেশাজীবী পল্লী উদ্যোক্তা দল : পেশাজীবী উদ্যোক্তা বলতে যাদের কর্মকাণ্ড মূলত আত্মকর্মসংস্থানমূলক এবং যারা নিজস্ব আইডিয়া, নতুন প্রযুক্তি, স্থানীয় বাজারজাতকরণ সুবিধা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং যারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে কিছুটা সফলতা অর্জন করেছেন এবং ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে যাদের অধিকতর সফলতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে তাদেরকে নিয়ে নবগঠিত দল বুঝাবে।

৪) পেশাজীবী উদ্যোক্তা : নতুন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা পরিকল্পনা বাস্তব রূপ দেয়ার মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং আরও দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে নিজস্ব পরিকল্পনাকে ব্যবসায় রূপ দিতে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে পেশাজীবী উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যেমন-

একক উদ্যোক্তা : ব্যবসায় অর্থের সংকুলান সাপেক্ষে মার্কেট বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নির্ধারণপূর্বক, যিনি অন্যের অধীনে চাকরির পরিবর্তে নিজেই ছোটখাটো একটি ব্যবসা শুরু করেন, তাকে একক উদ্যোক্তা বলে।

পেশাজীবী একক উদ্যোক্তা : পেশা একটি ফার্সি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জীবিকা বা জীবনধারণের উপায়। কাজেই জীবনধারণের জন্য মানুষ যে কাজ করে বা যে উপায় অবলম্বন করে তাকে পেশা বলে। আর নতুন নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনবলের মাধ্যমে নিজের উদ্ভাবিত আইডিয়া বা কোনো পরিকল্পনাকে ব্যবসায়িক বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া বা উদ্যোগী ভূমিকা নেয়াকে পেশাজীবী একক উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা তাঁর পরিকল্পনাকে ব্যবসায়ে রূপ দেওয়ার জন্য সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ এবং মেধা, শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে।

উল্লেখ্য, পিইপি এর নিজস্ব কর্মসূচির সাথে কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সুবিধা পৃথক প্রণোদনা হিসেবে যুক্ত হবে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

- অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সুবিধাভোগী হবেন না;
- বিআরডিবি হতে ইতিপূর্বে গৃহীত ঋণ (যদি থাকে) ১০০% পরিশোধ থাকতে হবে;
- পেশাভিত্তিক কাজে প্রশিক্ষিত/দক্ষ/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃজনে সক্ষম;
- বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচিসহ অন্য যেকোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির সমিতি/দলের গ্র্যাজুয়েট সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং ঐ এলাকার ক্ষুদ্র/মাঝারি উদ্যোক্তা হতে হবে/এন্টারপ্রাইজ থাকতে হবে;
- কমপক্ষে ১ (এক) বছর সমিতি/দলের সদস্য হিসেবে আছেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে পর্যবেক্ষণকাল অতিক্রম করেছেন);
- বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম;
- বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনায় নতুন সদস্য ভর্তির মাধ্যমে এই ঋণ বিতরণ করা যাবে।

বিনিয়োগের খাতসমূহ

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক অন-ফার্ম ও অফ-ফার্ম কার্যক্রম এবং আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে সেবাখাতসহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য যেকোনো খাতকে বিবেচনায় নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগের খাত নির্বাচন করা যেতে পারে-

- স্থানীয়ভাবে উদ্যোক্তাদের চাহিদা;
- উদ্যোগের নতুন নতুন আইডিয়া;
- অল্প পরিমাণে বিনিয়োগে স্বল্পতম সময়ে অধিক মুনাফা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন উদ্যোগসমূহ;
- যে সকল উদ্যোগে বেশি সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
- যে সকল উদ্যোগে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম;
- যে সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা বেশি;
- কম ঝুঁকিপূর্ণ আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

বিনিয়োগের কতিপয় খাতের উদাহরণ

ফুল/ফলমূলের চাষ, মৌমাছি চাষ, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, নার্সারি, মৎস্যচাষ/হ্যাচারি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, ধান ভানা/চাতাল, মৃৎশিল্প, শতরঞ্জি শিল্প, তাঁত বা বুনন শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, কাঠ/স্টিলের আসবাবপত্র বা সরঞ্জাম তৈরি, কাঁসা-পিতল-

ব্রোঞ্জ শিল্প, প্লাস্টিক/মেলামাইন শিল্প, লোকাল মটরযান/বোট নির্মাণ শিল্প, মোবাইল ফোন দোকান/বিজনেস, গহনা তৈরি (স্বর্ণ, রুপা, সিটিগোল্ড, মাটি, কাঠ), মোমবাতি তৈরি, মশার কয়েল তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মনোহারি দোকান এবং আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

ঋণ সীমা

- একজন উদ্যোক্তা সদস্যের একক ঋণের সীমা হবে সর্বনিম্ন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সক্ষমতা ভেদে সদরদপ্তরের অনুমোদনসাপেক্ষে এই ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।
- বিজনেস প্ল্যানের ভিত্তিতে উদ্যোক্তার প্রকৃত চাহিদা, বিনিয়োগের সক্ষমতা, কর্মকাণ্ডের ধরন, কর্মকাণ্ডে তার নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির ওপর ঋণের পরিমাণ নির্ভর করবে।
- সর্বক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের জন্য বিজনেস প্ল্যানে উল্লিখিত সর্বমোট বিনিয়োগের ন্যূনতম ৩০% ঋণগ্রহীতা নিজে বিনিয়োগ করবেন।

ঋণের মেয়াদ ও সেবামূল্য

ঋণের মেয়াদ হবে দুই বছর (২৪ মাস)। সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। উদ্যোক্তাগণ ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৪% সেবামূল্যে এই ঋণ সুবিধা পাবেন।

বিআরডিবি সৃষ্টিলগ্ন থেকে পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়নকল্পে কৃষিতে 'সেচ-সার-বীজ' প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান, কর্মসৃজন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চলমান উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বিআরডিবি'তে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। উল্লেখ্য, বিআরডিবি'র মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি সুফলভোগী সদস্যদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলধন সহায়তা হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হতো। এ ঋণের সিলিং নির্ধারিত ও অত্যন্ত কম হওয়ায় সিলিংয়ের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার পর বর্ধিত চাহিদার যোগান দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় সুফলভোগীগণ অনেকক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকত। অনেকে নিজেদের প্রয়োজনে বিআরডিবি ছেড়ে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে বাধ্য হতো। উদ্যোক্তা ঋণ নিঃসন্দেহে পল্লীর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং বিআরডিবি'র প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এ ঋণের মাধ্যমে পল্লীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে।

উপসংহার

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের পল্লী অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারের একটি মানবিক উদ্যোগ 'পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ'। প্রায় দেড় বছর যাবৎ চলমান করোনা অতিমারিতে বাংলাদেশসহ বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ইতোমধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিশেষ করে দেশের ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তাগণ যারা তাদের শেষ সম্বলটুকু বিনিয়োগ করে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাসহ পল্লী অর্থনীতি সচল রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখেন তাদের অনেকেই আজ ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘ সময় করোনাজনিত বিধিনিষেধের কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেকে পুঁজি হারিয়ে ফেলেছেন, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা হারিয়েছেন। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 'পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ' গ্রহণ করে ক্ষতি পুষিয়ে পল্লী অর্থনীতিতে পুনর্বাসনের সুযোগ পাবেন। বিআরডিবি সরকারের এ ধরনের একটি মহৎ উদ্যোগের অংশীদার হতে পেরে সত্যিই গর্বিত।

মোঃ সাজেদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (আরইএম), বিআরডিবি, ঢাকা

বিআরডিবি'র নবজাগরণে মহাপরিচালকের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি'র (আইআরডিপি) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণরূপে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবি সর্বস্তরে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছেন, বর্তমান মহাপরিচালক এর গৃহীত ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১। স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত পল্লী বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার যে ভিত্তি রচনা করেন এরই স্থায়ী কাঠামো হিসেবে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ও উন্নত পল্লী গড়ার যে স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লালন করেছিলেন তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাঁধে নেয় বিআরডিবি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, স্বনির্ভর ও উন্নত পল্লী গড়ার ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের। এ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ম্যান্ডেট তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে দেশের ৬৪ জেলাধীন

সকল উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম, পাড়া বা মহল্লায় বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে।

সময়ের বিবর্তনে বিআরডিবি'র এ বহুমুখী কর্মকাণ্ড কিছুটা সংকুচিত হলেও পল্লী জীবিকায়ন সৃষ্টি ও পল্লী অর্থনীতি সচলীকরণের মাধ্যমে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে বিআরডিবি। তবে গত মার্চ, ২০২০ থেকে দেশে চলমান কোভিড-১৯ (করোনা) মহামারি, অর্থনৈতিক মন্দা, শিল্পকারখানা বন্ধ অবস্থা, নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, ব্যাপক ফসলহানি, পল্লী জনগণের কর্মহীনতা ইত্যাদি কারণে অন্যান্য সকল জাতিগঠনমূলক বিভাগের ন্যায় বিআরডিবি'র সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে বিআরডিবিতে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) হিসেবে যোগদান করেন জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু এবং চলামান সংকট উত্তরণের মহাপরিকল্পনা হিসেবে হাতে নেন ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১, যা বিআরডিবি'র সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি করেছে এক নবজাগরণ।

প্রেক্ষাপট

কোভিড-১৯ প্রথম ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়লেও বাংলাদেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ২০২০ সালের ০৮ মার্চে। এ সময় জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু বাংলাদেশ সরকারের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় বিআরডিবি'র মহাপরিচালক (গ্রেড-১) হিসেবে আদেশপ্রাপ্ত হন। প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে ফিরে স্বাস্থ্যবিধির আওতায় যথারীতি কোয়ারেন্টাইন পালন করে ২৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক (গ্রেড-১) হিসেবে যোগদান করেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে। যোগদান শেষে ৫, কাওরান বাজারস্থ পল্লী ভবনে আসেন। সেসময় আশেপাশের অন্যান্য সকল অফিসের ন্যায় পল্লী ভবন একেবারেই সুনসান- তেমন কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী নেই, নেই আগের মতো কোলাহল, নেই কোনো অভ্যর্থনা। এ অবস্থায় মোটেও ব্যথিত বা নিরুৎসাহিত হননি নবযোগদানকৃত মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, বরং মর্ম বেদনাকে ভীষণ উৎসাহ ও শক্তিতে রূপান্তর করেন তিনি। কারণ, মহাপরিচালক হিসেবে বিআরডিবি'তে যোগদানের পূর্বে (হোম কোয়ারেন্টাইন সময়ে) বিআরডিবি সম্বন্ধে (বিআরডিবি'র সৃষ্টি, গৌরবময় ঐতিহ্য, অতীত কর্ম পরিধি, বর্তমান অবস্থা, সমস্যা, সমস্যার পিছনের সমস্যা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি) তিনি সুন্দরভাবে রপ্ত করেছিলেন, নিকট অতীত বা বর্তমান সময়ে আর কেউ এতটা করেছেন বলে কোন নজির নেই। এজন্য বিআরডিবি'র বর্তমান সংকট কাটিয়ে অতীত গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি অতি সহজেই হাতে নিতে পেরেছিলেন নবজাগরণ সৃষ্টিকারী এ ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, বিদ্যমান সকল প্রকার অনিয়ম নিয়মিতকরণ এবং জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত একগুচ্ছ কর্মসূচির নাম ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১।

ক্র্যাশ প্রোগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ,
- অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিতকরণ,
- মাঠ পর্যায়ের সময়োপযোগী রিপোর্টিং সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক তৈরি
- ঋণ কার্যক্রমের অফলাইন ডাটাবেইজ তৈরি,
- ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন,
- মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণ সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা,
- বুক কিপিং, অ্যাকাউন্টস্ ও রেকর্ডস্ হালনাগাদকরণ,
- বিদ্যমান অনিয়মসমূহ নিয়মিতকরণ,
- দেশব্যাপী সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তরের দীর্ঘদিনের পেন্ডিং নিরীক্ষা সম্পাদন,
- ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কর্মে উজ্জীবিতকরণ,
- দৈনিক মনিটরিং ও সাপ্তাহিক নিবিড় মনিটরিং সম্পাদন, এবং
- জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

ক্র্যাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কম্পোনেন্ট

মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু মহোদয় ক্র্যাশ প্রোগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কিছু কম্পোনেন্ট নির্ধারণ করেন। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্টসমূহ যথা :

করোনাকালীন মনিটরিং সেল

গত মার্চ, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক বিভাগের ন্যায় বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং সমিতি ও দল পর্যায়ে মাঠকর্মীদের যথাযথভাবে গমনাগমনের ক্ষেত্রে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। এজন্য মহাপরিচালক মহোদয় তাৎক্ষণিকভাবে বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে কর্মকর্তাদের রুটিনমাফিক দায়িত্ব দিয়ে একটি মনিটরিং সেল স্থাপন করেন। মনিটরিং সেলের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিনই টেলিফোনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং সমিতি ও দল পর্যায়ে মাঠকর্মীদের গমনাগমন নিশ্চিত করেন।

ক্র্যাশ প্রোগ্রাম সেক্রেটারিয়েট

মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু মহোদয় ক্র্যাশ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত সকল নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সার্বিক সমন্বয় সাধনের জন্য বিআরডিবি'র সদরদপ্তর পল্লী ভবনে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম সেক্রেটারিয়েট স্থাপন করেন। ক্র্যাশ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সার্বিক সমন্বয়সাধনের নিমিত্ত এ সেক্রেটারিয়েটে মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি এক্সপার্ট টিম এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, কর্ম সম্পাদন ও মাঠ পর্যায়ের সাথে সমন্বয়সাধনের জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ রয়েছে।

টাস্কফোর্স

করোনাকালীন ও করোনাপরবর্তী সময়ে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর আওতায় মহাপরিচালক মহোদয় ০৫ টি টাস্কফোর্স গঠন করেন। সরকারের ০৫ জন যুগ্মসচিব ও বিআরডিবি'র পরিচালক এক একটি টাস্কফোর্স এর নেতৃত্বে রয়েছেন। এছাড়া প্রতিটি টাস্কফোর্সে যুগ্ম পরিচালক পর্যায়ের একজন মনিটরিং কর্মকর্তা এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকসহ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি অডিট ও পরিদর্শন টিম রয়েছে।

ফোকাল পয়েন্ট

মাঠ পর্যায়ের জেলা ও উপজেলা থেকে অডিট ও পরিদর্শন টিম, মনিটরিং কর্মকর্তা এবং কখনো টাস্কফোর্স প্রধান এর মাধ্যমে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক মনিটরিং এর ভিত্তিতে সংগৃহীত সকল তথ্য উপজেলা, জেলা, বিভাগওয়ারি এবং সমগ্র দেশের প্রেক্ষিতে একীভূতকরণ, বিশ্লেষণ, তুলনামূলক গ্রাফিক চিত্র তৈরি এবং মন্তব্যসহ তা মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের জন্য এক জন ফোকাল পয়েন্ট

খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম বিআরডিবি সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জ।

রয়েছেন। তিনি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম সেক্রেটারিয়েট এর সাচিবিক দায়িত্বও পালন করেন।

ভার্চুয়াল সভা

ক্র্যাশ প্রোগ্রামের অন্যতম আর একটি কম্পোনেন্ট হলো মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল সভা। মহাপরিচালক মহোদয় নিয়মিতভাবে অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা আনয়ন এবং বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশনা প্রদান করছেন।

ক্র্যাশ প্রোগ্রামের অর্জনসমূহ

মাঠ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিতকরণ

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বাংলাদেশে গত মার্চ, ২০২০ এর প্রথম সপ্তাহে দেখা দিলে পর্যায়ক্রমে এলাকাভিত্তিক শুরু হয় লকডাউন, অফিস আদালতে উপস্থিতি সীমিতকরণ, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার ঘোষণা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-মার্কেট-শিল্প কারখানা বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। এ অবস্থায় বিআরডিবি'র জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয় মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং সমিতি ও দল পর্যায়ে মাঠ কর্মীদের গমনাগমন নিশ্চিত করা। কারণ, বিআরডিবি'র বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অন্যতম। প্রত্যহ এবং নিয়মিত তদারকির ঘাটতি হলে ঋণ আদায় ও বিতরণ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়বে এবং এক পর্যায়ে তা বন্ধ হয়ে যাবে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মহাপরিচালক মহোদয় তাৎক্ষণিকভাবে বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লী ভবনে একটি মনিটরিং সেল স্থাপন করেন। মনিটরিং সেলের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিনই টেলিফোনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি, সমিতি ও দল পর্যায়ে মাঠ কর্মীদের গমনাগমন এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করেন। যার ফলে বিআরডিবি'র ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পূর্ণ গতিতে পরিচালিত হয়েছে, ঋণ আদায় ও বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খেলাপি ঋণ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

সময়োপযোগী রিপোর্টিং সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক তৈরি

গৃহীত ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ফলে মাঠ পর্যায় থেকে সদর দপ্তর পর্যন্ত রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের চলমান ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় বর্তমানে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রমের সমৃদ্ধ রিপোর্ট সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রস্তুত হচ্ছে এবং তা জেলার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অতি স্বল্পসময়ে ইন্টারনেটে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরীক্ষা ও পরিদর্শন দলের দলনেতার নিকট উপস্থাপন করা হচ্ছে। দলনেতা জেলা ও উপজেলা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনমতো একীভূত করে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তা ও টাস্কফোর্স প্রধানের নিকট উপস্থাপন করছেন। টাস্কফোর্স প্রধানগণ প্রাপ্ত রিপোর্ট বিশ্লেষণ এবং বিভাগওয়ারি একীভূত করতঃ দ্রুততার সাথে মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করছেন। মহাপরিচালক মহোদয় সকল রিপোর্ট অবলোকন করতঃ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহকারে তা ক্র্যাশ প্রোগ্রাম সেক্রেটারিয়েটে প্রেরণ করেন।

ঋণ কার্যক্রমের উপজেলা ও জেলাভিত্তিক সাপ্তাহিক রিপোর্টিং এভাবে প্রতি সপ্তাহেই মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। রিপোর্টিং নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে এটি এক নবজাগরণ যা ইতিপূর্বে কখনোই ছিল না।

ঋণ কার্যক্রমের অফলাইন ডাটাবেইজ তৈরি

রিপোর্টিং এর সনাতন পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায় থেকে মাসিক ভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করা হলেও সদরদপ্তর পর্যায়ে এ সকল তথ্যের বিশ্লেষণ, ক্যাটাগরাইজেশন, উপজেলাভিত্তিক আদায় ও বিতরণের প্রবণতা, খেলাপির প্রবণতা, স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমস্যার বিশ্লেষণ ইত্যাদির কোনো ডাটাবেইজ ছিল না। বর্তমানে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় সাপ্তাহিক মনিটরিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের যে তথ্য মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে তা সদরদপ্তর পর্যায়ে বিশ্লেষণ করতঃ ঋণ বিতরণ, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ও চলতি খেলাপির পরিমাণ, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি থেকে আদায়, চলতি খেলাপি থেকে আদায়, আদায়ের হার (%), মেয়াদোত্তীর্ণের হার (%), ঋণ কার্যক্রমের প্রবণতা ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং সমগ্র দেশভিত্তিক এক বিশাল অফলাইন ডাটাবেইজ তৈরি হয়েছে। যার ফলে বিআরডিবি'র সদরদপ্তরে বসেই সারা দেশের যেকোনো উপজেলা এবং জেলার প্রতি সপ্তাহের ঋণ বিতরণ, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ও চলতি খেলাপির পরিমাণ, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি থেকে আদায়, চলতি খেলাপি থেকে আদায়, আদায়ের হার (%), মেয়াদোত্তীর্ণের হার (%), ঋণ কার্যক্রমের প্রবণতা ইত্যাদির চিত্র নিমিষেই অবলোকন করা যাচ্ছে।

মাঠ কার্যক্রমের শক্তিশালী মনিটরিং নেটওয়ার্ক সৃষ্টি

চলমান ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ফলে বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রমের যে শক্তিশালী মনিটরিং নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে এর দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। ইতিপূর্বে মাঠ পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিশ্লেষণমূলক ও মূল্যায়নধর্মী মনিটরিং খুব সামান্যই হতো।

রিপোর্টিং নেটওয়ার্ক

আর সেটা হতো একটি বিভাগ অর্থাৎ সরেজমিন বিভাগের একটি শাখা অর্থাৎ ঋণ শাখার মাধ্যমে। অন্য দু'একটি শাখা আরও কিছু রিপোর্ট সংগ্রহ করতো মাত্র। কিন্তু বর্তমানে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর আওতায় বিআরডিবি'র সরেজমিন, প্রশাসন, অর্থ, পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ বিভাগের সকল পরিচালক, সকল অনুবিভাগের প্রত্যেক যুগ্মপরিচালক এবং সকল শাখার প্রত্যেক উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক কোনো না কোনো জেলা বা উপজেলার মনিটরিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দৈনিক এবং প্রতি সাপ্তাহে জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ, সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরামর্শ প্রদান করছেন। মনিটরিং এর এত বড় কার্যকর নেটওয়ার্ক সত্যিই প্রশংসারযোগ্য।

ঋণ কার্যক্রমে বিশেষ করে খেলাপি ঋণ আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি

ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর আওতায় মাঠ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিতকরণ, রিপোর্টিং সিস্টেম ও

তারিখ	সপ্তাহ নং	সপ্তাহের শুরুতে মাঠে বকেয়া				বিবেচ্য সপ্তাহে আদায়				সপ্তাহ শেষে মাঠে বকেয়া			মেয়াদ উ. খেলাপী হারের (%) প্রবণতা
		চলতি	মেয়াদোত্তীর্ণ	মোট	সপ্তাহে বিতরণ প্রবণতা	চলতি থেকে আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ আদায় প্রবণতা	সপ্তাহে মোট আদায় প্রবণতা	নতুন করে মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী	চলতি	মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপীর পরিমাণ	মোট	
৩১/১০/২০	১	৯৩৮৮৯.৭৬	৫০২৮৬.১৬	১৪৪৮৬২.৮৯	২২৬৯.৭৪	১৮৩৬.৮৭	৫১৩.০৫	২১৯৬.৬৯	১৩১.০১	৯৪১৩৩.০৭	৫০২২৩.৬৮	১৪৩৯০৭.১৭	34.90
০৮/১১/২০	২	৯৪১৩৩.০৭	৫০২২৩.৬৮	১৪৩৯০৭.১৭	২২৯৮.০১	১৮৪৫.১১	৫১১.৯২	২৩৫৬.৪১	০.	১১০৮১০.৪৬	৫১১৬৩.২৬	১৪৯০৭৭.৯৯	34.32
১৫/১১/২০	৩	৯৪১৩৩.০৭	৫০২২৩.৬৮	১৪৩৯০৭.১৭	২২৯৮.০১	১৮৪৫.১১	৫১১.৯২	২৩৫৬.৪১	০.	১১০৮১০.৪৬	৫১১৬৩.২৬	১৪৯০৭৭.৯৯	34.32
২২/১১/২০	৪	৯৮১৬৩.৮৭	৪৮৮৯৮.৮২	১৪৯৫২৭.১৩	২৫৯৯.৩	২১৬৭.২৮	৪৮৭.৩৬	২৬৫৮.৪৯	৩০৩.৪৫	৯৯৯৯৭.৬১	৪৮৫২০.৯৯	১৪৮৫১৮.৩৬	32.67
২৯/১১/২০	৫	১০১৩২৬.৯৩	৪৯৫৬৮.৮৯	১৫৩৩৬৮.৪৬	২৫২১.৩৩	২৩৫৫.০২	৫৩৮.৯৩	২৮৯৩.৯৫	৫২০.১	১০২৭৭৭.১২	৪৯৩৫৩.৪৫	১৫২১০৯.১৩	32.45
৩০/১১/২০ - ২৬/০৬/২১	৬-৩৪ গড়ে	১০৮৮২৫.৬৯	৪৭৫১৫.৯১	১৫৬৩৪১.৬	২৫৪.৫৯	৪৮৭.০৭	১৩০.৭৫	৫৩৫.৯	২৩৮.১২	১০৮৩৫৫.০৯	৪৭৬৯৭.২	১৫৬০৬০.২৯	30.56
২৭/০৬/২১	৩৫	১১৪৯৫৩.৬২	৪৭২৭১.৬৯	১৬২২২৩.৩১	৫০৭৯.৫৪	২৮৮৯.৮৯	৪৯৩.২৩	৩২৯৯.৬১	৬৫০.৪৪	১১৬৫০৯.২৯	৪৭৫১৫.৩১	১৬৪০১৬.৫৭	28.97
০৪/০৭/২১	৩৬	১০৮৮২৫.৬৯	৪৭৫১৫.৯১	১৫৬৩৪১.৬	২৫৪.৫৯	৪৮৭.০৭	১৩০.৭৫	৫৩৫.৯	২৩৮.১২	১০৮৩৫৫.০৯	৪৭৬৯৭.২	১৫৬০৬০.২৯	30.56
১১/০৭/২১	৩৭	১০৭৬৭৪.৬৭	৪৬৯৫৩.৫১	১৫৪৬২৮.১৮	১৭১০.৯৪	১০০৯.১৪	৮৮.১৮	১০৯৭.৩২	১৬৩.১৩	১০৮২১৩.৪	৪৭০২৮.৪৭	১৫৫২৪১.৮৭	30.29
১৮/০৭/২১	৩৮	১০৮২১৩.২৬	৪৭০২৫.৯৩	১৫৫২৩৮.৮১	৯৩১.১৮	৪২৪.৩৩	১১৬.৭৭	৪৫৮.৮৮	৬২.৩৮	১০৮৬৮০.৩২	৪৭০২৫.২১	১৫৫৭০৫.৫৩	30.20
২৫/০৭/২১	৩৯	১১০২৯২.৬৬	৪৭৩৭৯.৬২	১৫৭৬৭২.২৮	১০৮৫.০১	১০৫২.৩৫	১৬৯.৭১	১১৩৯.৬৭	১৬২.৯	১১০১৬৫.৪৩	৪৭৪৫৫.২	১৫৬৬২০.৫৯	30.30
০১/০৮/২১	৪০	১১০২৬৫.২৪	৪৭৪৭১.৯৩	১৫৭৭৩৭.১৭	১২৩২.৪৯	১১৩২.৩৪	২০২.১৬	১২৫৩.১৫	৩৯৩.৩৬	১০৯৯৭৭.২৮	৪৭৭৩৯.০৫	১৫৭৭১৭.৬১	30.27
০৮/০৮/২১	৪১	১০৮৩৬৪.৯৭	৪৭৩৮৫.৯২	১৫৫৭৫১.২৯	১৯৬২.২৪	১৬৬১.৯৮	২১০.৩৯	১৭৯২.৮৫	২০৫.৭৬	১০৮৪৫৬.৫৫	৪৭৪৬০.৭৮	১৫৫৯১৯.৮১	30.44
১৫/০৮/২১	৪২	১১০১৯৫.৯৬	৪৭৮২১.১৬	১৫৮০১৭.১২	২০৭০.২২	১৯৯২.৭৭	২৮৪.৫১	২১৯৭.৪৮	১৯১.৫৯	১১০১১৩.৬৩	৪৭৮০৭.৯৬	১৫৭৮৮৯.৭৮	30.28
২২/০৮/২১	৪৩	১০৯৯৪৯.৭৮	৪৭৯২৩.০৩	১৫৭৮৭২.৮১	৩৩৯৩.২৩	২৫৫৫.২	৩৯১.১৬	২৮৬৯.	১৪২.২	১১০৬৩৬.২৮	৪৭৭৫১.৬১	১৫৮৩৯৬.৮৭	30.15
২৯/০৮/২১	৪৪	১০৯০৪২.১৫	৪৭৪৩১.০৭	১৫৬৪৭৩.২২	২৬০৬.৭৮	২৪৯৮.০৯	৪৪৭.১৩	২৮১৮.৯৩	১৭৫.১৪	১০৯০২৩.২২	৪৭২৩৭.৮৫	১৫৬২৬১.০৭	30.23

৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সমগ্র দেশের ঋণ বিতরণ, আদায় অগ্রগতি ও খেলাপীর চিত্র।

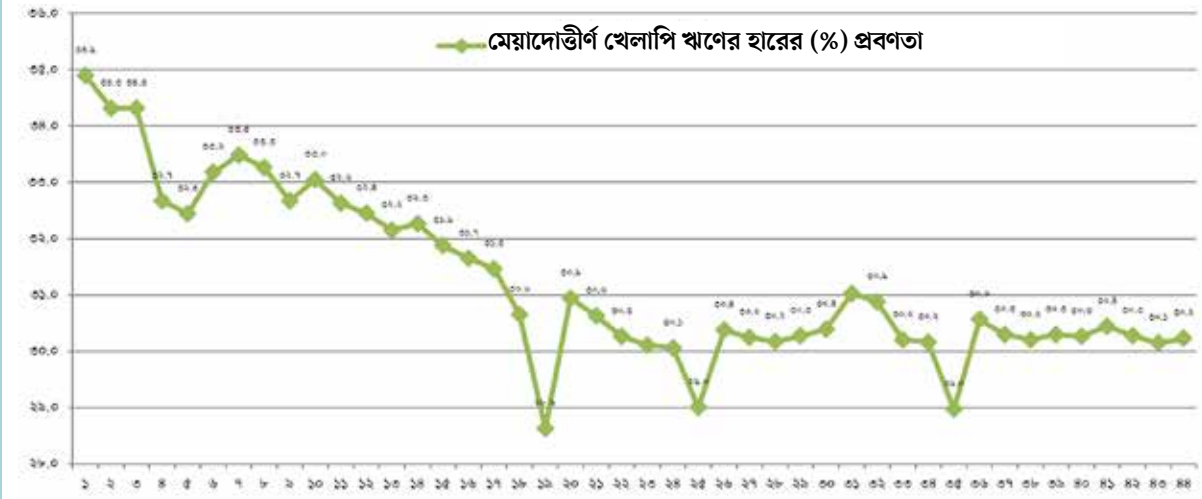

৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের শতকরা হারের প্রবণতা।

ঋণ কার্যক্রমের অফলাইন ডাটাবেইজ তৈরি এবং বিশেষ করে মাঠ কার্যক্রমের শক্তিশালী মনিটরিং নেটওয়ার্ক সৃষ্টির ফলে মাঠ পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে মাঠে ঋণ আদায় ও বিতরণ বেড়েছে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের হার (%) ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে বুক কিপিং, অ্যাকাউন্টস্ ও রেকর্ডস্ হালনাগাদ তৈরি

ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় দেশব্যাপী সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তরের দীর্ঘদিনের পেন্ডিং নিরীক্ষা সম্পাদন করার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড হাতে নেন জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিআরডিবি, ঢাকা। এ কর্মকাণ্ডের আওতায় সারা দেশের সকল উপজেলায় সকল প্রকল্প/কর্মসূচির সমিতিওয়ারি ও সদস্যওয়ারি ডিটেইল লিস্ট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ক্যাশ বহি, সাধারণ খতিয়ান, সাবসিডিয়ারি লেজার, বছরভিত্তিক ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, পিএল অ্যাকাউন্ট, সকল বিল-ভাউচার, অব্যয়িত তহবিলের হিসাব, পাশ বহি, ডব্লিউসিএস ইত্যাদিসহ সকল প্রকার বুক কিপিং, অ্যাকাউন্টস্ ও রেকর্ডস্ হালনাগাদকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স প্রধান, মনিটরিং কর্মকর্তা, অডিট ও পরিদর্শন দলের সকল সদস্য মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে তদারকি অব্যাহত রেখেছেন এবং কোন রেকর্ডস্ কোন তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদ রয়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রায় সকল বুক কিপিং, অ্যাকাউন্টস্ ও রেকর্ডস্ হালনাগাদ তৈরি হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘদিনের পেন্ডিং নিরীক্ষা সম্পাদন

দেশব্যাপী সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তরে দীর্ঘদিনের নিরীক্ষা কার্য পেন্ডিং থাকার প্রেক্ষিতে এ পেন্ডিং নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রায় সকল বুক কিপিং, অ্যাকাউন্টস্ ও রেকর্ডস্ হালনাগাদ তৈরি করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে ৫টি টাস্কফোর্সের আওতায় ২৫ টি অডিট ও পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬টি জেলার ৩০টি উপজেলার অডিট ও পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট অডিট সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিআরডিবি, ঢাকা মহোদয়ের গৃহীত ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১ এর বর্ণিত অর্জনসমূহ ছাড়াও আরও বিশেষ কতিপয় সাফল্য রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারের নিকট থেকে করোনাকালীন ১৫.০০ কোটি টাকার প্রণোদনা (স্যালারি সাপোর্ট হিসেবে) এবং ৩০০.০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা ঋণ তহবিল অনুদান প্রাপ্তি। এ ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে একদিকে যেমন দৈনিক ও সাপ্তাহিক নিবিড় মনিটরিং নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে অন্যদিকে তেমনি সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক কথায় বিআরডিবি এখন অফুরন্ত সম্ভাবনায় উজ্জীবিত এবং নতুনভাবে জাগরিত।

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার, কর্মসূচি পরিচালক, পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি, ঢাকা ও ফোকাল পয়েন্ট, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম ২০২০-২০২১

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর প্রশিক্ষণ মিশন ভাসানচর-২০২১

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার ও
মোহাম্মদ মহিদুর রহমান মোল্লা

ভূমিকা

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে একটি হলো মিয়ানমার, যার পূর্ব নাম ও কথ্যরূপ বর্মা বা বার্মা। মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ছোট রাষ্ট্র হলেও এখানে জাতিগত বিদ্বেষ-হিংসা-নিপীড়ন-নির্যাতন বেশ বড়। এমনই এক জাতিগত নিপীড়ন-নির্যাতন আর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বিশাল এক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিজ ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে বাংলাদেশে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তুচ্যুত এ বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শুধু শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দেননি, বরং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিজ দেশে ফেরানোর জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিপন্ন এ জনগোষ্ঠীর জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ, খাদ্য সাহায্য প্রদানসহ সুন্দর জীবনযাত্রার লক্ষ্যে তাদেরকে স্থানান্তরিত করেন পরিকল্পিতভাবে তৈরি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসংবলিত ভাসানচরে। সরকারি উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সরকারের জাতিগঠনমূলক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ও সক্ষমতা সৃষ্টিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে- যা বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ মিশন ভাসানচর, ২০২১ নামে অভিহিত।

প্রেক্ষাপট

বিগত ১৯৭৮ সাল থেকে মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জাতিগত নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে শুরু করে। ঐ সময় প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কক্সবাজার সীমান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সেখানকার সামরিক জান্তার রোহিঙ্গাবিরোধী অভিযানের শিকার হয়েও আরও প্রায় অর্ধ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। অতঃপর ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নির্বিচার গণহত্যা ও নিধনযোগ্য শুরু হলে সময়ের ব্যবধানে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ-শিশু সীমান্ত পেরিয়ে ও সমুদ্রপথে জীবন হাতে নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এরূপ চরম দুর্দশা ও মানবিক বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ শতাব্দীর বৃহত্তম বৈশ্বিক মানবিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ভাসনচরে তাদেরকে স্থানান্তরিত করাসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ও সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শুরু হয় বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ মিশন ভাসানচর, ২০২১।

জাতীয় পর্যায়ে এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাঃ

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের কক্সবাজার হতে ভাসানচরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় পর্যায়ে এক্সিকিউটিভ কমিটির এক সভা গত ১১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিআরডিবি'কে ভাসানচরে স্থানান্তরিত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক, জীবনযাত্রার সহায়ক এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ভাসানচরে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ

ভাসানচরে বর্তমানে ৪টি সরকারি দপ্তর শরণার্থীদের জন্য সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। যেমন :

(১) শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের দপ্তর- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন এটি একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো। এ দপ্তরের মাধ্যমে শরণার্থী রোহিঙ্গাদের মাঝে ঔষধ, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

(২) বাংলাদেশ নৌবাহিনী- সরকারের এ দপ্তরের মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩ এর আওতায় ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসবাসের জন্য ১২০ টি ক্লাস্টার বা গুচ্ছগ্রামে ১,৪৪০ টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এগুলোর তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

(৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)- সরকারের এ দপ্তরটি ভাসানচরে স্থানান্তরিত মিয়ানমার নাগরিকদের জীবিকায়ন ও সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক, জীবনযাত্রার সহায়ক এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

(৪) বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী- ভাসানচরে একটি পুলিশ থানা স্থাপন করা হয়েছে, যা সেখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত।

বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ।

মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক ভাসানচরে প্রশিক্ষণ মিশনের যাত্রা শুরু

সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিআরডিবি হতে গত জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি. মাসে দুটি টেকনিক্যাল টিম ভাসানচরে প্রেরণ করা হয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য। সম্ভাব্যতা যাচাই দলের প্রতিবেদন ও সুপারিশের আলোকে বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্য বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। গত ২৭ জানুযারি, ২০২১ খ্রি. তারিখে জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিআরডিবি এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন।

বিআরডিবি'র প্রশিক্ষণ মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে আইজিএভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান,
- শরণার্থীদেরকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরকরণ,
- সীমিত পরিসরে হলেও তাদের আয়-রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি,
- অধিকতর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি,
- ভাসানচরের অভ্যন্তরে সুবিধাদি কাজে লাগিয়ে নিজ পরিবারের জন্য উৎপাদনের সুযোগ তৈরি,
- বিআরডিবি'র দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও উন্নয়ন কৌশল অবহিতকরণ,
- ভাসানচরের জীবনপ্রণালির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার পদ্ধতি শেখানো,
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় অবহিতকরণ, এবং
- বিভিন্ন অসামাজিক কার্যক্রম নেশা, মাদক, চোরাচালান ইত্যাদি থেকে নিবৃত্তকরণ,

প্রশিক্ষক প্যানেল

প্রশিক্ষণ মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনার্থে বর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিআরডিবি'র একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষক প্যানেল তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী এ সকল কর্মকর্তা বিআরডিবি'র ঢাকা সদরদপ্তর এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত রয়েছেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

এ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দুটি ক্লাস্টারের দুটি শেলটার সেন্টার এর পাঁচটি ভেন্যু ব্যবহার করা

ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মহাপরিচালক, বিআরডিবি, জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু।

হচ্ছে। এ পাঁচটি ভেন্যুতে পাঁচ দিন মেয়াদি একইসাথে পাঁচটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতিটি ব্যাচে ৫টি করে অধিবেশন পরিচালিত হচ্ছে। এ হিসেবে পাঁচ দিন মেয়াদি প্রতিটি ব্যাচে ২৫টি অধিবেশন পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ১০টি অধিবেশন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এবং ১৫টি আয়বর্ধক দক্ষতা উন্নয়নমূলক। প্রত্যেকটি ব্যাচে প্রতিদিন একটি ব্যবহারিক ক্লাস বা অধিবেশন নেয়া হয়ে থাকে। ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ যেমন সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেলাই মেশিন, কুটিরশিল্প উপকরণ, ব্লক-বাটিকের উপকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে হাতকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আয় উপার্জনকারী দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নানান ধরনের বিষয়বস্তু সংবলিত একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্যানেল প্রশিক্ষকগণ এ মডিউল অনুসরণ করে শরণার্থীদেরকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রেডভিত্তিক স্বল্প দীর্ঘমেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে: নানা ধরনের পোশাক তৈরির জন্য কাপড় কাটা ও সেলাই, বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্প (বাঁশ, বেত ও কাঠশিল্প, হস্তচালিত তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি), অন্যান্য শিল্প যেমন শঙ্খ, ঝিনুক, হাতির দাঁত ও হাড় থেকে মালা, বোতাম, শাখা, চিরুনি, খেলনা ইত্যাদি তৈরি, নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ, জাজিম, ব্রাশ প্রভৃতি তৈরি, লোনা পানি থেকে লবণ তৈরি, হোগলা পাটি তৈরি, বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন, শাক-সবজি চাষ, পুকুরে মৎস্য চাষ ইত্যাদি।

এছাড়াও বিআরডিবি ভাসানচরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নানা ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে: পরিবারের সদস্যদের বিশেষতঃ শিশুদের সাধারণ অসুখ-বিসুখ এবং প্রতিকার, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার, সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া, জীবাণুমুক্ত পানি পান, মানব পাচারের বিপদ ও সতর্কতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ভাসানচরে বসবাসকারী সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য, মাদকের কুফল আইনগত শাস্তির বিধান, দ্বীপাঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা, শিশু প্রতিপালন ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব, কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, সামাজিক সহিংসতা বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সাইক্লোন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকবিলায় প্রস্তুতি ও করণীয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

এ পর্যন্ত (আগস্ট/২০২১) দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নানান বিষয়ে দুই পর্যায়ে মোট ১২০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ম পর্যায়ে ১৫টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ৫০ জন) মোট ৭৫০ জনকে এবং ২য় পর্যায়ে ১০৫টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে) মোট ৪,২০০ জনকে সর্বমোট ৪,৯৫০ জন নারী-পুরুষ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ২,৯২৯ জন ও মহিলা ২,০২১ জন।

প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা

ভাসানচরে বিআরডিবি'র মাধ্যমে যে সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কিছুটা দক্ষ করে তোলা হচ্ছে সেসকল শরণার্থীর মাঝে সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের দপ্তর (আরআরআরসি) এর মাধ্যমে

বিআরডিবি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি. তারিখে আরআরআরসি'র মাধ্যমে বিআরডিবি হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ১০০টি সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা হিসেবে প্রদান করেছে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক অর্গানাইজেশন আল্লামা আবুল খায়ির ফাউন্ডেশন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার ম্যান্ডেট নিয়ে একদিকে যেমন দেশের ৬৪ জেলার সকল উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রামে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা ও সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে, অন্যদিকে তেমনি বর্তমানে বহুল আলোচিত রোহিঙ্গ সংকট নিরসনে সরকারি উদ্যোগের সাথে সামিল হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ভাসানচরে বাস্তবায়ন করছে অনন্য এক প্রশিক্ষণ মিশন। এ মিশনের আওতায় বিষয়বস্তুতে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে বিআরডিবি প্রশিক্ষণ শুরু করতে না পারলেও খুব শীঘ্রই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতৎসত্ত্বেও বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের ফলে ভাসানচরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন ও জীবিকায়নে বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসতে শুরু করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ব্যাপক পরিমাণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যে ভাসানচরে আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাদের প্রবল আগ্রহের কারণে বিআরডিবি প্রশিক্ষণ ব্যাচের সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করছে। এছাড়াও আয় বর্ধনশীল প্রশিক্ষণে ওমানে রপ্তানীযোগ্য টুপি সেলাই প্রশিক্ষণ এবং বুটিক, বাটিক, অ্যাম্ব্রয়ডারি, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি ট্রেডে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উপসংহার

"Mother of Humanity" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এর এ মহতী উদ্যোগের সাথে শামিল হতে পেরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নিজেকে ধন্য মনে করছে। বিআরডিবি'র প্রদত্ত জীবিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক এ প্রশিক্ষণ একদিকে যেমন বাংলাদেশে অবস্থানকালীন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন কাজে আসবে, তেমনি মিয়ানমারে ফিরে যাবার পরও এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। আমরা বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গাদের) দ্রুত, নিরাপদ ও সসম্মানে প্রত্যাবাসন কামনা করছি।

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার, কর্মসূচি পরিচালক, পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, বিআরডিবি, ঢাকা।
মোহাম্মদ মহিদুর রহমান মোল্লা, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিআরডিবি, ঢাকা।

পল্লী উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও বিআরডিবি'র কার্যক্রম

মোরশেদ আলম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ, নিবেদিত প্রাণ, কর্মনিষ্ঠ নেতা এবং সর্বজনগ্রাহ্য কোনো মতবাদকে প্রায়োগিক অনুশীলনের মাধ্যমে কার্যকর করার এক জাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। যিনি আমৃত্যু স্বপ্ন দেখেছেন দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। এই লালিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ১৯৬৫-১৯৬৯ সময়কালে ''বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD)'' কুমিল্লা Pilot Project আকারে যে বহুমাত্রিক পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগের সূচনা করেছিল সেই উদ্যোগকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে সারাদেশে সম্প্রসারণ করেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশ মূলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সেই থেকে বিআরডিবি পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়নকল্পে '' বীজ-সার-সেচ'' প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আয়-সঞ্চারী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্ম

সৃজন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অগ্র সেনানীর ভূমিকা পালন করে আসছে।

পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত শতকে বেশ কিছু মডেলের বিকাশ লাভ করে; যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো ১৯০৪ সালে গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক (Village Co- operative Bank), ১৯৫৩ সালে গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (V- AID), ১৯৫৯ সালের কুমিল্লা মডেল এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত ১৯৭৬ সালের গ্রামীণ পদ্ধতির ক্ষুদ্র ঋণ অন্যতম।

পল্লী উন্নয়নের পথিকৃৎ, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ড. আখতার হামিদ খান অবিভক্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে একজন আইসিএস অফিসার ছিলেন। মানুষের দরিদ্রতা, অনাহার, অর্ধাহার অপুষ্টি, বিশেষভাবে ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের উপর মহাজন, জোতদারদের শোষণ, নিপীড়ন তাকে বিচলিত করতো। তাই মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ১৯৫৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে কুমিল্লার অদূরে পাকিস্তান একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (PARD) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীতে যা বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (BARD) হিসেবে নামকরণ করা হয়। যেটি কুমিল্লা একাডেমি/ মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে।

কুমিল্লা মডেলের ৪টি কম্পোন্যান্ট :

১) থানা ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট সেন্টার (TTDC);
২) রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম (RWP);
৩) থানা সেচ কর্মসূচি (TIP);
৪) দ্বিস্তর সমবায় কাঠামো (Two tier Co-operatives)।

স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে কুমিল্লা জেলার ৭টি থানায় এবং পরবর্তীতে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার ২১টি থানা ও কুমিল্লার বাইরে ময়মনসিংহের গৌরিপুর ও গাইবান্ধা জেলার সদর থানা এবং নাটোর সদরসহ মোট ২৪টি থানায় এর কাজ সম্প্রসারণ করা হয়। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পর এ ২৪টি থানার কার্যক্রম ফলপ্রসূ প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার IRDP এর কাজ সারা দেশে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এটি জাতীয় কর্মসূচিতে রূপ নেয়। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং বলতেন 'সমবায়ের পথ হলো সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পথ'। তিনি আরও বলতেন '' বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, আর আরাধনার ধন। আর সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশে পাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে''।

আইআরডিপির প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

- প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষি ও ভূমিহীনদেরকে গ্রাম পর্যায়ে সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করা এবং থানা পর্যায় কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ) গঠন;
- সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে পুঁজি গঠন;
- সহজ পদ্ধতিতে ও বিনা জামানতে কৃষিঋণসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;
- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে তথা উচ্চ ফলনশীল ধানসহ অন্যান্য প্রধান ও অপ্রধান শস্যের বীজ সরবরাহসহ উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে ফলন ও উৎপাদন বাড়ানো;
- চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার;
- সুসম সার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা ;
- পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- পাওয়ার পাম্প, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, হস্তচালিত নলকূপ ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন, শুষ্ক মৌসুমে সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বোরো চাষের প্রচলন, সম্প্রসারণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- হাজা-মজা পুকুর, পতিত জমি, খাসজমি ইত্যাদি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীনদেরকে ইজারা প্রদান করত: মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, শাক সবজির চাষ ও স্থানীয় উপযোগীতা অনুযায়ী চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা;
- নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো;
- প্রাথমিক সমিতিতে সাপ্তাহিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ এবং উপরোক্ত প্রযুক্তি ও কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- কৃষি উপকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রাপ্তি, বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর থানা পর্যায়ে ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।

সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বহু কর্মকৌশল গৃহীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিআরডিবি'র গ্রামভিত্তিক কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিতকরণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, আধুনিক কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সমবায় বিপণন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বীজ-সার-সেচ প্রযুক্তির আওতায় গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়ন করে। কৃষক সমবায়ের উপরিকাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সমিতির সুদৃঢ় কাঠামো। কেন্দ্রীয় সমিতির ব্যাপকতর ব্যাংকিং ও ঋণ সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ, বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তিনির্ভর টেকসই প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা বিস্তৃতকরণ ও বিদ্যুতায়নের আওতায় সেচ কার্যক্রম গ্রহণ এবং গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচির আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন/পরিবর্তনে অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে বিকশিত হয় দ্বিস্তর সমবায়ের।

১৯৭১ সালে যাত্রা শুরুর পর এর সফলতা লক্ষ করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সালে আইআরডিপিকে ''বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা'' নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা মডেলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরও অধিকতর Piloting না করে কর্মসূচিটিকে সংস্থায় রূপান্তর করা সমীচীন হবে না মর্মে দাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে ১০ মাস পর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে পুনরায় আইআরডিপি পুনর্বহাল করা হয়। আইআরডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ওপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। উক্ত সমীক্ষায় প্রতিবেদনে, সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থাটি গ্রামীণ জনগণের জন্য কল্যাণকর এবং ক্ষমতাশালী কৌশল হিসাবে কাজ করেছে, যা পল্লী উন্নয়নের একমাত্র পেটেন্ট হিসেবে দাবি করতে পারে। বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে আইআরডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল পরিবর্তন করে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে। সর্বোপরি এ সমীক্ষার সুপারিশ এবং দারিদ্র্য বিমোচন

উঠান বৈঠক, মহালছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

কার্যক্রমকে অধিকতর অগ্রাধিকার দেওয়ার নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রূপান্তরিত করে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে মহান জাতীয় সংসদে পল্লী উন্নয়ন আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর রয়েছে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, পেশাদারিত্ব, চৌকস ও নিবেদিতপ্রাণ এক বিশাল কর্মীবাহিনী।

কুমিল্লা মডেলের ৪টি কম্পোনেন্টের মধ্যে ৩টিই স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে, অর্থ্যাৎ TTDC- উপজেলা পরিষদ, RWP- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং TIP- বিএডিসি'র একটি স্বতন্ত্র উইং হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিআরডিবি'র কুমিল্লা মডেলের শুধুমাত্র দ্বিস্তর সমবায় কাঠামো থেকে যায়। আশি দশকের শেষে এবং নব্বই-এর দশকের প্রারম্ভে এনজিওদের ব্যাপক বিস্তার এবং কুমিল্লা মডেলের সমন্বিত কর্মসূচিগুলো স্বতন্ত্র অধিদপ্তর হয়ে যাওয়ায় বিআরডিবি'র কার্যক্রম অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে পড়ে। সত্তরের দশকে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান 'পল্লী উন্নয়নে সোনালি সোপান' হিসেবে বিআরডিবি'র অবদান আজ বহুল প্রশংসিত। সত্তরের দশকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্বিগুণ হওয়ার পিছনে বিআরডিবি'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত। সে সময় বিআরডিবি বিভিন্ন ধরনের হস্তচালিত নলকূপ, গভীর নলকূপ কৃষকদের মাঝে বিতরণের মাধমে সেচ ব্যবস্থা গতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে। সত্তর থেকে নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিও গ্রহণ করে।

তৎপরবর্তীতে বিআরডিবি তার মূল কর্মকাণ্ড অর্থাৎ দ্বিস্তর সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেশ কিছু বিশেষায়িত প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে, যেমন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি(১৯৭৩), যুব উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৭৮), বিত্তহীন কর্মসূচি(১৯৮৪) ইত্যাদি। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত এসব বিশেষায়িত প্রকল্পের সফলতার মূল্যায়নের ভিত্তিতেই বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে যেমন-মহিলা উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পিডিপিএফ ইত্যাদি। কিন্তু দক্ষ নেতৃত্ব এবং সময়ের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে বিআরডিবি'র কর্মকৌশল ও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে দ্বিস্তর সমবায়ের পাশাপাশি বিআরডিবি অনানুষ্ঠানিক দলীয় কার্যক্রম চালু করে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন'২০১৮ অনুযায়ী বোর্ডের অন্যতম কার্যাবলি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি, পল্লী উন্নয়ন দল এবং উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্ব-শাসিত ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা । এছাড়াও জাতিসংঘ ঘোষিত এবং সরকার কর্তৃক অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের লক্ষ্যমাত্রা -২০৩০ এর ১, ২, ৫ ও ৮ লক্ষ্যমাত্রা - (১) সকল প্রকার দারিদ্র্যের অবসান, (২) ক্ষুধার অবসান, (৫) নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস ও (৮) শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্ত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে

প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে বিআরডিবি পল্লীর সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থেকে দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর লালিত সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিরন্তর কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান(বিআইডিএস) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাইকা ও জাপানের কিয়েটো বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে ''লিংক মডেল'' নামে একটি টেকসই মডেল উদ্ভাবন করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই মডেলের মাধ্যমে গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে Vertical Linkage এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের সেবা গ্রহণকারী গ্রামবাসী ও সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মী ও জন প্রতিনিধিদের Horizontal Linkage সৃষ্টি করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়। অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প(পিআরডিপি) এর লিংক মডেলের মূল লক্ষ্য হলোো জনগণের চাহিদা মাফিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য Bottom Up Planning বাস্তবায়ন করা। এ মডেলের মূল কাঠামো হলো ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা(ইউসিসিএম)। ইউসিসিএম হলো একটি Mini Parliament যেখানে ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় গ্রামের পাড়া রাস্তা কালভার্ট, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ড্রেনেজ, সাঁকো, আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন, স্কুলের আঙিনায় মাটি ভরাট, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি। এ প্রকল্পের আওতায় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় সীমার মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার ১৫% সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের নগদ/কায়িকশ্রমে, ৫% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এবং বাকি ৮০% প্রকল্প হতে সরকারি সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। বিআরডিবি'র কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এ প্রকল্পটি সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

এছাড়াও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, সুসম ও টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে যেমন- দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপীড়িত হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ''উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)', বৃহত্তর ফরিদপুর

সুফলভোগী কৃষকদের প্রদর্শনী প্লট, বিআরডিবি

অঞ্চলে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়া কৃষকদেরকে অপ্রধান শস্য, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই, সরিষা, তিল, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি চাষে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহায়ক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বর্ণিত অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য ২৫৬টি উপজেলায় ১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. মেয়াদে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ২০,৬৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি'র কার্যক্রম ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। আইআরডিপি'র সূচনালগ্নে পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আইআরডিপি'র কম্পোনেন্টগুলো স্বতন্ত্র অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হওয়ায় এবং নব্বইয়ের দশকে দেশব্যাপী এনজিও'র ব্যাপক বিস্তারের কারণে বিআরডিবি'র কার্যক্রম Redesign ও Modify করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লেও সরকারি সহায়তা ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়। তাছাড়া একই ধরনের Parallel অনেক প্রতিষ্ঠান সৃজিত হওয়ায় (যেমন-PDBF, SFDF) বিআরডিবি'র কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে গৃহীত হয়েছে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)। বিআরডিবি এ বৃহত্তর পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আঙ্গিকে নিজস্ব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকার যেমন এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (২০১৬-২০৩০)-এর সাথে সংগতি রেখে পরিকল্পনা দলিলগুলো পুনঃবিন্যাস করেছেন, বিআরডিবি'র কার্যক্রমেও এ লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হচ্ছে। সরকার অন্যদিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১-এর আলোকে পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্য এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর আঙ্গিকে প্রণীত হতে যাচ্ছে ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বিআরডিবি এ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে অনুসরণ করছে এবং ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালনায় দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Mapping) এবং দারিদ্র্য নিরূপণের (Poverty Tracking) ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণকালে বিআরডিবি এমন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করবে যা হবে এ পরিকল্পনার বিষয়গত অভিনিবেশের (Thematic Thrust) সাথে বহুলাংশে প্রাসঙ্গিক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক সরকার ৩য় মেয়াদে ২০১৮ সালে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক যে নির্বাচনি ইশতাহার ঘোষণা করেন, বিআরডিবি উদ্ভাবনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে, প্রত্যন্ত পল্লী এলাকায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার এ ইশতাহারে 'আমার গ্রাম-আমার শহর'-এর যে নতুন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, তার রূপায়নে বিআরডিবি বিদ্যমান প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাসে বিআরডিবি'র চৌকস মেধাবী ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা গণতান্ত্রিক সরকারের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব কর্মপরিসরে ভূমিকা রেখে চলেছেন।

মোরশেদ আলম, উপপরিচালক, বিআরডিবি, চট্টগ্রাম।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও বিআরডিবি

মোঃ জিয়াউল হাসান

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন পরিক্রমায় উজ্জ্বল নাম বাংলাদেশ। সামগ্রিক উন্নয়নে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ একটি রোল মডেল। সম্প্রতি জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিপিডি) ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নের পরে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা হতে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার জন্য সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। আগামী পাঁচ বছর প্রস্তুতিকাল বিবেচনায় এ সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উন্নয়নের চলমান গতিধারা অব্যাহত রাখা। বাংলাদেশের মতো উন্নয়ন সোপানে অবস্থানরত দেশের টেকসই উন্নয়নে পল্লী অঞ্চলের সুসম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই পল্লী উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক ধারণায় পল্লী উন্নয়নে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি পর্যায়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)।

পল্লী উন্নয়ন

পল্লীর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সামগ্রিক বিষয়াবলির ধারাবাহিক এবং ক্রমাগত উন্নয়নই পল্লী উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে Atchoarena & Gasperini (২০০৩) প্রদত্ত নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি সামগ্রিকতার ভিত্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য -

"পল্লী উন্নয়ন হচ্ছে সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন। পল্লীর মানুষের সম্পদ (প্রাকৃতিক, বস্তুগত, মনুষ্য, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ) ও সেবা প্রাপ্তির উত্তম সুযোগ এবং উৎপাদনক্ষম মূলধন (আর্থিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক) এর উপর নিয়ন্ত্রণ যা তাদের ন্যায়সংগত ও টেকসই উন্নয়নের সক্ষমতা প্রদান করে।"

টেকসই পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক উন্নয়ন এবং সমষ্টিগত বা কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। পল্লী জনপদের সক্ষমতা উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও রাজনৈতিক কার্যক্রমসমূহের সম্পর্ক ও সমন্বয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পল্লীর মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক কার্যক্রম, নেতৃত্ব, অন্তঃ ও আন্তঃযোগাযোগ এর মাধ্যমে সমষ্টিগত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সক্ষমতা পল্লী উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করে।

পল্লী উন্নয়নে অংশীজন (Stakeholder)

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন আঙ্গিকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে যেমন ব্যক্তি প্রচেষ্টা আছে, তেমনি স্থানীয় সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সেবামূলক সংস্থা প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগ বা কার্যক্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল্লী উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশ্লেষণ করা হলে সাধারণভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে ক. পল্লীর জনগণ : সেবাগ্রহণকারী, উদ্যোগী ব্যক্তি, অনিবাসী ব্যক্তি, Sponsor ব্যক্তি, খ. দায়িত্বশীল ব্যক্তি : ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ইউপি সচিব, জাতিগঠনমূলক সংস্থার প্রতিনিধি, গ্রাম পুলিশ/চৌকিদার, গ. অন্যান্য : এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং গ্রুপ/প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর শ্রেণিতে ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সরকারি দপ্তর, বেসরকারি দপ্তর ইত্যাদি বিবেচনা করা যায়।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন

সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন অংশীজনের অংশগ্রাহী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তদালোকে কার্যক্রমের পরিমার্জিত বাস্তবায়ন টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পল্লী উৎপাদন ও বিপণন সংযোগ, স্থানীয় সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার, সেবা ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে কাঠামোগত ও সংগঠিত সংযোগ স্থাপন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে জড়িত পক্ষসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, সামগ্রিক ও টেকসই পল্লী উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

পল্লীর সামগ্রিক সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে অগ্রাধিকার ক্রমনির্ণয়, অধিক্রমণ বা বাদপড়া পরিহার, জরুরি প্রয়োজন ও জনগুরুত্ব বিবেচনা, সর্বোপরি উপযোগিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও উৎপাদনশীলতা বিবেচনায় বিদ্যমান সম্পদ ও সুবিধার সুসম বণ্টন নিশ্চিতকরণে স্বীকৃত ফোরাম কর্তৃক সমন্বয়, সহযোগিতা বা পরিচালনাই হচ্ছে সমন্বিত উন্নয়নের মূল চেতনা। সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের পরিকল্পিত, অগ্রাধিকারভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী জনপদের সুসম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াই হচ্ছে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন।

টেকসই পল্লী উন্নয়নে সমন্বয়ের ভূমিকা

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সাধারণত অর্থনৈতিক নির্ণায়কসমূহ সামাজিক বা পরিবেশগত নির্ণায়কের তুলনায় বেশি প্রাধান্য পায়। টেকসই এবং সমন্বিত উন্নয়নে শুধু আয় ও সম্পদ নয় বরং জীবনযাত্রার মান, সামাজিক মান ও মর্যাদা, নিরাপত্তা, সামাজিক বা সংঘবদ্ধ অগ্রসরতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য প্রভৃতি উৎপাদনের সম্মিলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ যৌগিক বিন্যাস ব্যবস্থায় টেকসই পল্লী উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না গেলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষাপটে পল্লীর সামষ্টিক সক্ষমতা উন্নয়নের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহ সাধারণত উপজেলা পর্যায়ের দাপ্তরিক অবস্থান হতে কর্মীদের মাধ্যমে নিভৃত পল্লীতে সেবা প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় করা না গেলে দ্বৈততা বা বাদ পড়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি সময় ও সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত হয় না এবং অপচয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পল্লীর জনগণের কাঙ্ক্ষিত এবং মানসম্পন্ন সেবা হতে বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ থাকে। এ কারণে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন অতীব জরুরি।

সমন্বিত পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড শুরু থেকেই সমন্বিত পল্লী উন্নয়নে প্রায়োগিক উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক সমিতি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় অ্যাসোসিয়েশন (ইউসিসিএ) এর মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের প্রতিটি উপজেলায় দ্বিস্তর সমবায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) কৃষি উন্নয়ন, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উপকরণ সরবরাহ (সেচ-সার-বীজ প্রযুক্তি) মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রবাহ, গোডাউন (সংরক্ষণাগার) ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন, সরবরাহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। এ সকল কার্যক্রম তৎকালীন পল্লী উন্নয়নে যুগান্তকারী সফলতা নিয়ে এসেছিল। পরবর্তীকালে আইআরডিপি'র উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কৌশলের আওতায় কৃষির সাথে সাথে পল্লীর অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবাভুক্তি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিআরডিবি আজ ৫৮.০৯ লক্ষ প্রত্যক্ষ সদস্যের এক গর্বিত পরিবার।

বিআরডিবি'র জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সমন্বিত পল্লী উন্নয়নে কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ এর মাধ্যমে পল্লীর সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্ব সাধন করে চলেছে। জাইকা, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ড এবং বিআরডিবি'র যৌথ গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে পাইলটিং, মূল্যায়ন ও মডেলিং এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'লিংক মডেল' সমন্বিত পল্লী উন্নয়নে বিপুল সফলতা অর্জন করেছে। এ মডেলটি 'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি)' এর মাধ্যমে দেশের ৬৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় পল্লীর জনসাধারণকে উন্নয়নে অংশীদারকরণ, চাহিদাভিত্তিক ঊর্ধ্বমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহ সমন্বয়ে 'গ্রাম উন্নয়ন কমিটি' ও 'ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি' সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। Mini Parliament হিসেবে পরিচিতি প্রাপ্ত ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি'র

লিংক মডেলের অর্জনসমূহ (ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত)

ক্র. নং	কার্যক্রম	অর্জনের একক	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	মন্তব্য
১	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন	টি	৭,৬৮০	
২	গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সভা	টি	২,৫১,৩৩২	
৩	ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন	টি	৬৫০	
৪	ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা	টি	৩২,৫৬৭	
৫	অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ	টি	১৩,৯৯৮	প্রকল্প-৮০%, উপকারভোগী - ১৫% ইউনিয়ন পরিষদ - ৫%
৬	প্রশিক্ষণ	লক্ষ জন	৬.৯৮	

সূত্র : পিআরডিপি-৩, বিআরডিবি, ঢাকা

সভায় জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী, সেবা গ্রহণকারীদের পক্ষে গ্রাম কমিটির প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট সহায়তাকারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ ফোরামের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা, উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারীর নিকট উপস্থাপিত হয় অপরদিকে সেবাপ্রদানকারীর তথ্য, অণুসূচি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে পারেন। ফলে সেবা প্রাপ্তি সহজ হয়, উন্নয়ন কার্যক্রম ও সমজাতীয় সেবার সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়। এ কাজের প্রণোদনা হিসেবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পল্লীর ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন বিআরডিবি'র একটি প্রশংসিত উদ্যোগ।

এতদ্ব্যতীত ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক, উন্নয়ন ও সমন্বয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিআরডিবি Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় HELVETAS Swiss Intercooperation Bangladesh এর সাথে পার্টনারশীপে SDC Local Governance Programme Sharique Phase IV বাস্তবায়ন করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বরিশাল ও গাইবান্ধা জেলার ১৭টি উপজেলার মোট ১৬৯টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও সচিবদের ১১টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরোক্ষভাবে এই কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে উন্নয়ন ও সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। যার সুফল ভোগ করছে পল্লীর জনগণ।

বিআরডিবি সমন্বয় কার্যক্রমের প্রভাব

পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র অর্জন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। পল্লীর কৃষি-অকৃষি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে সমিতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, উপকরণ যোগান, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সহায়তা, মূলধন সহায়তা, বিপণন সংযোগ সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিআরডিবি প্রভূত সফলতা অর্জন করেছে। দ্বিস্তর সমবায় বা পল্লী উন্নয়ন সমিতিভিত্তিক কার্যক্রম, পল্লী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন, আর্থিক সেবাভুক্তি ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র কর্মকাণ্ডের প্রভাব সর্বজনবিদিত। উৎপাদনের শুরু হতে বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয়ে বিআরডিবি'র ভূমিকা পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। লিংক মডেল কার্যক্রম উপজেলা-ইউনিয়ন-গ্রামের মধ্যে চাহিদা ও পরিকল্পনার ঊর্ধ্বমুখী এবং সেবা ও উন্নয়নের অধঃসংযোগের মাধ্যমে কার্যকর Vertical লিংকেজ স্থাপন করেছে। একইসাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা ও উন্নয়ন

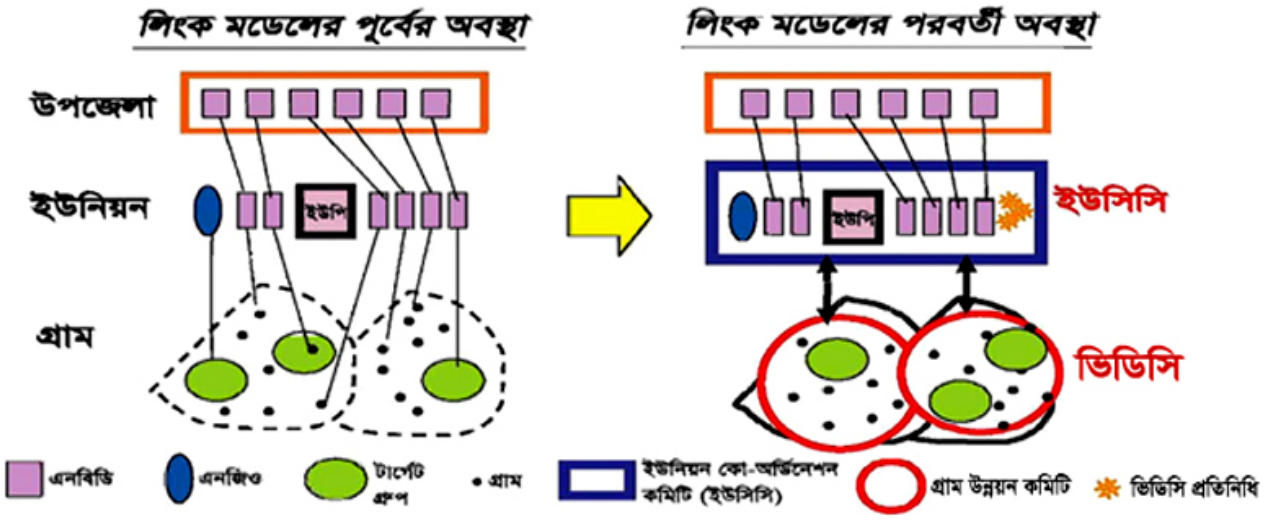

কর্মী এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটি'র মধ্যে কার্যকর Horizontal লিংকেজ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

লিংক মডেল বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে একদিকে যেমন সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ, স্বত্ব চেতনা (Sense of Ownership) নিশ্চিত হয়, অন্যদিকে পল্লীর জনগোষ্ঠীর মাঝে সহিষ্ণুতা, অগ্রাধিকার বিবেচনা ও গণতন্ত্র চর্চার বিকাশ ঘটে এবং আন্তঃযোগাযোগ (Networking) বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিকতা বিবেচনায় ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে উল্লিখিত Horizontal এবং Vertical লিংকেজ, প্রয়োজনানুসারে সেবা প্রবাহ এবং সুসম ও পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যমান নীতি-কৌশলে সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের সুযোগ

পল্লী উন্নয়নকে সুসংহত করার জন্য প্রশাসনিক সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিভিন্ন পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং গবেষণায় উঠে এসেছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চলমান কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জোরদার করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সদাশয় সরকার বিভিন্ন নীতি-কৌশল গ্রহণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করছে। এ সকল নীতি কৌশলেও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন -

রূপকল্প ২০৪১

রূপকল্প ২০৪১ এ সুশাসন মানব সম্পদ ও সক্ষমতা উন্নয়ন, সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা উন্নয়নে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমন্বিত উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর অভীষ্ট ১, ২, ৫, ৮ এবং ১৭ এর সাথে বিআরডিবি'র কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সকল অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষুধা ও অপুষ্টির অবসান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও শোভন কর্ম সুযোগ, আর্থিক সেবা ও উদ্যোক্তা ক্রমোন্নতি, বৈষম্য হ্রাসসহ বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে এসডিজি বাস্তবায়ন ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টভাবে সমন্বয় এর বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে "..... suitable rural development efforts through the **coordination** with well-structured LGIs ...." (পৃষ্ঠা-৪৩৩)। এ সময়ের চ্যালেঞ্জ হিসেবে 'Coordination of Rural Services and Development Activities' (পৃষ্ঠা-৪৩৮) উল্লেখের সাথে সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্দেশ্য অংশে বিধৃত হয়েছে "Ensure linkages among farmers, non- farm employees and markets for marketing products" (পৃষ্ঠা-৪৫৭)।

উক্ত পরিকল্পনার 'কৌশলগত অগ্রাধিকার' এ বর্ণিত পল্লী উন্নয়নের কৌশলসমূহের প্রায় সবগুলোতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সংস্থা বিআরডিবি। এ সকল কৌশলের সফল বাস্তবায়নে পল্লীর সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য। তাই সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিআরডিবি অংশে যথার্থই বর্ণিত আছে - "BRDB will enforce the activities of coordinating among the rural stakeholders, developing local leadership as community catalyst, ... with stakeholders participation in its regular work strategies" (পৃষ্ঠা-৪৬২)।

ভবিষ্যৎ করণীয়

রূপকল্প ২০৪১ অনুসরণে উন্নত তথা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বিত প্রয়াসের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে -

১. তৃণমূল পর্যায়ে গঠিত পল্লী সংগঠনসমূহকে উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং তাদের যোগাযোগ ও সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন;
২. ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির পুনর্গঠন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও ফাংশনিং নিশ্চিতকরণ;
৩. ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, সমন্বিত বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত মূল্যায়ন;
৪. পল্লী জনপদের কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন সক্ষমতা তথা পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন-মূল্যায়ন-পরিমার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বত্ব চেতনা (Sense of Ownership) উন্নয়ন;
৫. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও ডাটাবেস পরিচালনা;
৬. পল্লী উন্নয়নে নারীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
৭. পল্লীর সার্বজনীন জীবিকায়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং স্থানীয় চাহিদা ও উদ্যোগের সমন্বয় সাধন;
৮. পল্লী নেতৃত্বের বিকাশ এবং পল্লী জনপদের অন্তঃ ও আন্তঃযোগাযোগ (Networking) উন্নয়ন;
৯. লিংক মডেল এর আওতায় পল্লী উন্নয়ন সমন্বয় কার্যক্রমকে বিআরডিবি'র অন্যতম মূল কার্যক্রম হিসেবে দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা।

পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের দক্ষ ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমন্বয়ের দায়িত্ব বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের আওতায় পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে বিআরডিবি, উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/বিভাগের পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রতিবেদন সংগ্রহ করে একীভূত আকারে উপজেলা উন্নয়ন সভায় উপস্থাপন করবে। এছাড়া একীভূত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক বিআরডিবি ও উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে। পর্যায়ক্রমে বিআরডিবি উপজেলা দপ্তর পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে উপজেলা পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। বিভিন্ন দপ্তরের পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতা বা পরিধি নির্ধারণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা মডেলিং এর জন্য প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগের ১৬-৩২টি উপজেলায় উক্ত সমন্বয়ের বিষয়টি পাইলটিং করা যেতে পারে।

উপসংহার

আজকের পল্লী, উন্নয়নের পথে ধাবমান অগ্রসর এক জনপদ। পল্লীর জনপদের এই উন্নয়ন পরিক্রমায় বিআরডিবি একটি স্বীকৃত ও গর্বিত অংশীদার। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর ভিত হিসেবে সম্প্রতি প্রকাশিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমন্বিত ও টেকসই পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র উপর বহুমুখী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ে বিআরডিবি'র চলমান এবং আগামীর কর্মধারা আধুনিক ও উন্নত পল্লী বিনির্মাণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্নের সোনার বাংলার রূপচ্ছবি অঙ্কনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ জিয়াউল হাসান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা),
বিআরডিবি, ঢাকা
ziaul.kam@gmail.com

স্বাধীন বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

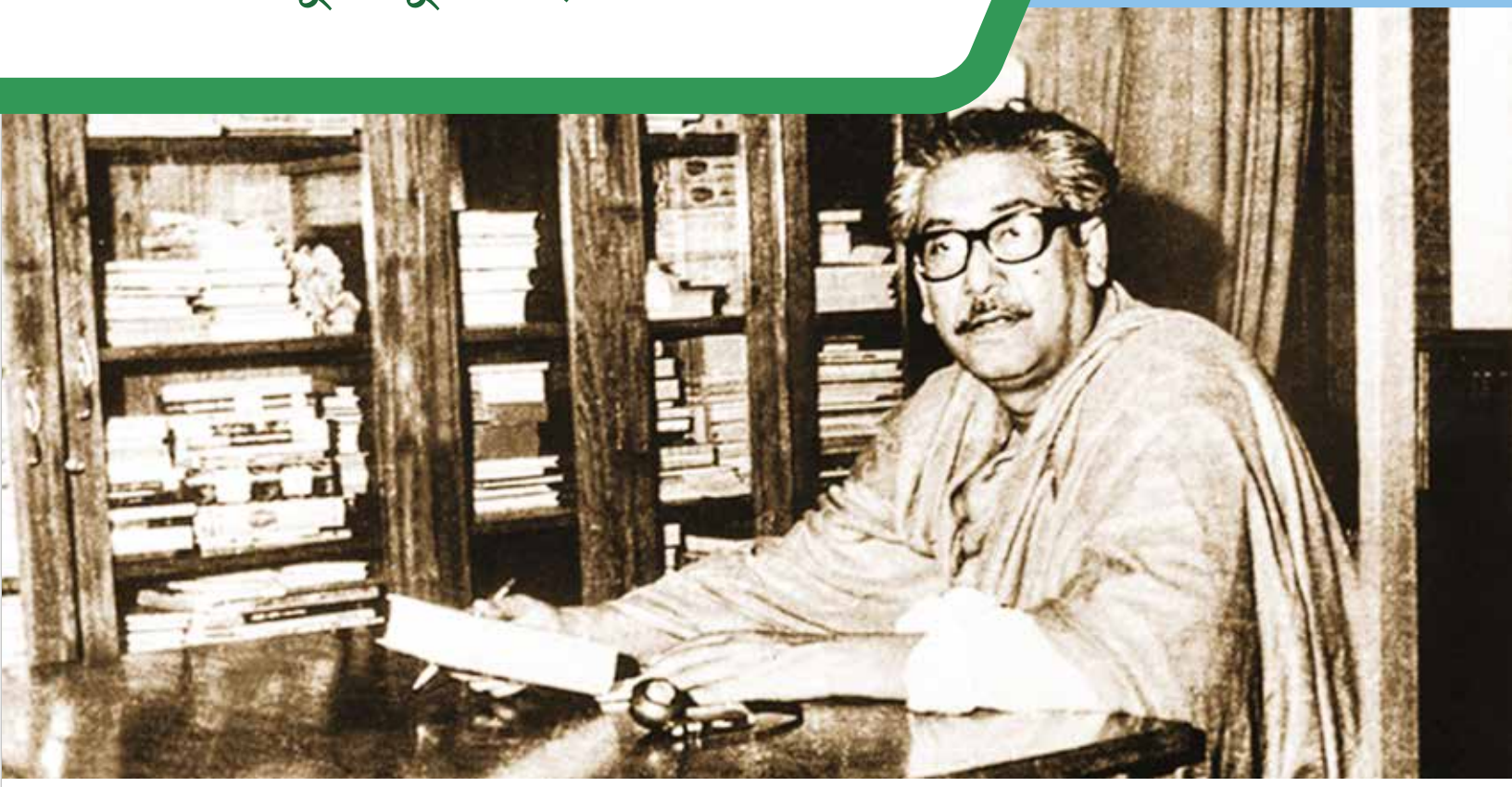

মোঃ শহীদুল ইসলাম

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি যাঁদের হাত ধরে মানবতার মুক্তির সনদ রচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ১৯২০ সালে ১৭ মার্চ জন্ম নেয়া হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের এই বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদারী থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থনৈতিক মুক্তির রূপরেখা রচিত হয় এ মহান নেতার হাতে। স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনর্গঠনে উদ্যোগ নেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যতীত সার্বিক উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার সদ্য স্বাধীন দেশে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। ঐ বছরের ২৫ জানুয়ারি ও ২৬ মার্চের ভাষণে

এর রোডম্যাপও তুলে ধরেন তিনি। এর মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল।

আরেক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে জুন মাসে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছিলেন এভাবে, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথম সরকারের মাত্র সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়টুকু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শূন্য থেকে শুরু করে তাঁর সরকারকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অগণিত সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং জাতিগঠন কার্যক্রম শুরু হয়। আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্য সংগ্রহ এবং আরও অনেক সমস্যার সমাধান তাঁর সরকারের সামনে সুবিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশে কৃষকের মুখে হাসি ফোটানো ও গ্রামীণ উন্নয়ন সফল করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৭২ সালে আইআরডিপি (বর্তমানে বিআরডিবি) সম্প্রসারিত করা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে আইআরডিপি গৃহীত কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ষাটের দশকের শেষভাগে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. আখতার হামিদ খান বিশ্ব নন্দিত 'কুমিল্লা মডেল' প্রবর্তন করেন। কুমিল্লা মডেলের অন্যতম প্রধান অঙ্গ 'দ্বিস্তর সমবায়' পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ১৯৭০-১৯৭১ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) জাতীয়ভাবে চালু করা হয়। যাত্রা শুরুর পর এর সফলতার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সালে আইআরডিপিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা মডেলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরও অধিকতর পাইলটিং না করে কর্মসূচিটিকে সংস্থায় রূপান্তর করা সমীচীন হবে না মর্মে দাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দশ মাস পর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আইআরডিপি পুনর্বহাল করা হয়।

বঙ্গবন্ধু দেশের খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সবার আগে কৃষি উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আধুনিক কৃষি উপকরণ ও অধিক উৎপাদনশীল বীজ ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করেছেন। পানি সেচের জন্য গভীর নলকূপ ও পাওয়ার পাম্প স্থাপন ও সেচের নালা নির্মাণের জন্য কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন। সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, পুঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি উন্নয়নের স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য ১৯৭৫ সালে 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি ও বেকার যুবকদের সৃজনশীল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। আইআরডিপির সফলতা মূল্যায়ন করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৮২ সালে আইআরডিপিকে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রূপান্তর করা হয় যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নামে পরিচিত।

আশি ও নব্বই দশকে সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়। পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ সাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসময় বিআরডিবি সিডা, ডানিডা, ইউকে, এডিবি, ইউনিসেফ, ইফাদ, ফাও, বিশ্বব্যাংক, নোরাড, ইউএনডিপি, জাইকাসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা বিআরডিবি'র সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করে।

উল্লেখ্য, দ্বিস্তর সমবায়ের আওতায় তদারকি ঋণের পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে নারী উন্নয়নে ঋণ সেবা চালু করে। পরবর্তীতে নব্বই দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে মঞ্জুরি প্রদত্ত ৩২০.০০ কোটি টাকায় বিআরডিবি ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। তৎপরবর্তীকাল থেকে বিআরডিবি সরকারি পর্যায়ে বিতরণকৃত ক্ষুদ্র ঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে আসছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিআরডিবি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১১৮ টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও ২৯টি উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়নাধীন সিভিডিপি প্রকল্পের কার্যক্রম বিআরডিবি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিআরডিবি প্রায় ৫১.৪০ লক্ষ গ্রামীণ পুরুষ-মহিলাকে ১.৭১ লক্ষ সমিতি/দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে। একই সময়ে সংগঠিত সমিতি/দলসমূহে বিআরডিবি ৭৫১.৬৯ কোটি টাকা মূলধন গঠন, ১৯,২৪৫.৭০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান, ১৮,৩৬০টি গভীর নলকূপসহ ৩.৫৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার সেচযন্ত্র সরবরাহ, ৪১.২০ লক্ষ উপকারভোগীকে দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে লিংক মডেল নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করে বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামার বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি লিড এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ এর সাথে নিবিড় সাদৃশ্য রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য নির্বাচন করেছেন তাদের মধ্যে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু মহোদয় অন্যতম। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রম আরও সুসংহতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের মানব সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পল্লী মানব সংগঠন সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান, পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়সহ পল্লী পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে বিপণন সংযোগ স্থাপনে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসনে প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন, ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধনসহ কার্যক্রম মনিটরিং এর পরিকল্পনা বিআরডিবি'র রয়েছে। আশা করা যায় গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে অতীতের

গাছ লাগাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মতো ভবিষ্যতেও বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলার ইতিহাসে জঘন্যতম দিন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ । মাত্র ৪৬ বছর। যার অঙ্গুলি হিলনে কোটি মানুষ প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মহামানবকে কতিপয় নরপিশাচ সপরিবারে হত্যা করে বাংলার মাটিকে কলঙ্কিত করে । বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার কতিপয় মানুষ নামের জানোয়ারেরা পিতৃহত্যার মতো ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নকে বিলীন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাঁর স্বপ্ন সারথীরা আজও জেগে আছে। ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোতে যে ২৬ দফা প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার ৮নং এ রয়েছে কৃষি, খাদ্য, ভূমি ও পল্লী উন্নয়ন।

সোনার বাংলা গড়ার জন্য নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা, সমস্যা-সংকট এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তারই সুযোগ্য কন্যা ষোল কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, উন্নয়নের রোল মডেল, দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ আজ স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বন্দর, মেট্রোরেল এর মতো বড় বড় প্রকল্প । বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলতেন। বলতেন পল্লী উন্নয়ন নিয়েও। বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। দেশের সিংহভাগ মানুষ যেহেতু এখনও গ্রামে বসবাস করেন, সেহেতু গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে সরকার বহুমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বর্তমান সরকার ২০২০-২০২১ সালকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেন।

জাতির মহান নেতা হতে হলে যে-সমস্ত গুণের প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর তা সবই ছিল । যে দেশটির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নের কথা নিয়েই যিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আত্মনিয়োজিত ছিলেন। কোনো প্রকার ভীতি কিংবা দ্বিধা তাঁকে কখনো বিচলিত করেনি। বাংলা ছিল তাঁর দেশ, বাংলা ছিল তাঁর ভাষা এবং তিনি নিজেকে বলতেন আমি বাঙালি । কবি মাসুম আহমেদের ভাষায় :

হৃদ অন্তরীক্ষের অংশুমালী তুমি
অনাবিল শ্রদ্ধা নিরন্তর,
তোমার স্বপ্নে জাগ্রত বাংলা
নিত্য বিস্ময়কর।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
কী করে তোমাকে ভুলি?
বঙ্গ হৃদয়ে তোমার ছবি
তুমিই স্বাধীনতার কবি।
ধমণিতে রক্ত যতদিন বহমান,
চির স্মরণীয় কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান!!

জন্ম শত বার্ষিকীতে এ মহান নেতার প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা !!!

মোঃ শহীদুল ইসলাম, উপপরিচালক, মনিটরিং ও সভাপতি, বিআরডিবি অফিসার্স এসোসিয়েশন।

বিআরডিবি : বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের অগ্রদূত

দীপক রঞ্জন ভৌমিক

'পল্লী' শব্দটি হলো ল্যাটিন বিশেষণ। পল্লী উন্নয়ন মানে গ্রামগুলোর ব্যাপকভাবে সার্বিক উন্নতি। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। তন্মধ্যে ৮৭,২২৩টি গ্রামে বাস করে ৬১.৮ ভাগ (বিশ্ব ব্যাংক-২০২০) অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ। সে হিসেবে দেশের জাতীয় উন্নয়ন পল্লী অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল হলেও বেশিরভাগ গ্রামেরই সার্বিক উন্নয়ন হয় না। একমাত্র পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমেই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত হতে পারে এবং তা সম্ভব হলে দেশের মানুষ কখনোই কর্মহীন তথা বেকার থাকবে না। সামগ্রিকভাবে, দেশ ও জাতির কল্যাণে টেকসই ও স্থায়ী পল্লী উন্নয়ন অপরিহার্য।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত 'সবুজ বিপ্লব' অর্থাৎ অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির

সফল বাস্তবায়ন অর্থাৎ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ষাটের দশকে বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেলের 'দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতি' দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয় । পল্লী উন্নয়নে সমন্বিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব বিবেচনায় দেশব্যাপী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ খ্রি. তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ইতিপূর্বে গঠিত বোর্ড পুনরুজ্জীবিত না করেই পল্লী উন্নয়ন সংস্থার ব্যানারে প্রথমে ২৩টি উপজেলায় আইআরডিপি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৯৭৩-'৮৫ সময়ে মোট ৩৫০টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। দেশব্যাপী বাস্তবায়িত আইআরডিপি'র অর্জিত সফলতার প্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে (Ordinance No. LIII/1982) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে বিআরডিবি'কে পল্লী উন্নয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের এনাম কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়। তখন থেকেই বিআরডিবি এদেশে পল্লী উন্নয়ন খাতে নিয়োজিত সর্ববৃহৎ একটি মুখ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য। ৩য় পর্যায়ের আইআরডিপি বাস্তবায়নকালীন বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক আইআরডিপি (বিআরডিবি)-এর কার্যক্রম মূল্যায়নের ভিত্তিতে জুলাই ১৯৮৫ তারিখে বিআরডিবি সরকারের রাজস্ব খাতভুক্ত হয়। পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Bangladesh Rural Development Board Ordinance, 1982 রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করে ২০১৮ সনের ১৫ নং আইনমূলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ নামে পুনঃপ্রণয়ন ও জারি করা হয়।

বিআরডিবি'র কার্যক্রম

প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক এবং মহিলাসহ অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কৃষক/মহিলা/বিত্তহীন সমবায় সমিতি/অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসার বিকাশ, উপকারভোগীদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র কার্যক্রম দেশের ৬৪ জেলার ৪৯৪টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি তথা কৃষক/মহিলা সমবায় সমিতির পাশাপাশি দারিদ্র্যের ঝুঁকি হ্রাস, দারিদ্র্য নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি উন্নয়ন, এলাকা উন্নয়ন, সেচ, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প/কর্মসূচি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে এবং এখনো বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

দশক ভিত্তিক বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত/সম্পাদিত পল্লী উন্নয় কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

সত্তরের দশক (১৯৭২-'৮০)

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সত্তরের প্রথম দশকে (১৯৭২-'৮০) বিআরডিবি ৩০০টি উপজেলায় ৩৫টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতি তথা আইআরডিপি-এর প্রাথমিক, ১ম, ২য় ও ৩য় পর্ব, মহিলা কর্মসূচি, সার বিতরণ কর্মসূচি, এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন কর্মসূচি, নির্মাণ প্রকল্প এবং গভীর নলকূপ/হস্তচালিত নলকূপ/সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রকল্প।

আশির দশক (১৯৮১-'৯০)

বিআরডিবি ৪৪৯টি উপজেলায় মোট ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে : আইআরডিপি-৩য় পর্ব, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, মহিলাদের জন্য জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প, ৩য় ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য মহিলাদের বিশেষ কর্মসূচি, যুব সমবায় কর্মসূচি, গণকূ/সেচ প্রকল্প, এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রকল্প, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প এবং সার বিতরণ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প।

নব্বই'র দশক (১৯৯১-২০০০)

বিআরডিবি দেশের ৪৬৫টি উপজেলায় মূল কর্মসূচি হিসেবে আইআরডিপি বাস্তবায়নের পাশাপাশি অপরাপর ৪৭টি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক। তন্মধ্যে মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প, একাধিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প, গণকূ/সেচ কার্যক্রম এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পসহ অন্যান্য একাধিক প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক (২০০১-২০১০)

বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে দেশের ৪৯৪টি উপজেলায় বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি অপরাপর ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ দশকের শুরুতেই 'একটি বাড়ি একটি খামার' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০০ থেকে জুন ২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১/০১/২০০১ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হলেও বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প শুরু হলে বিআরডিবি'র মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছে: কৃষি উন্নয়ন, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন, এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, সামাজিক ক্ষমতায়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, আদর্শ গ্রাম কর্মসূচি ও গুচ্ছ গ্রাম কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকল্প।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক (২০১১-২০২০)

এ সময়ে দেশের ৪৯৪টি উপজেলায় মূল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি অপরাপর ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। তন্মধ্যে কয়েকটির বাস্তবায়ন এখনও চলমান। বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: মহিলা উন্নয়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি), অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি ও সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রভৃতি ।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক (২০২১-২০৩০)

এ দশকের প্রথমভাগে অর্থাৎ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি কর্তৃক মোট ৩,৩১৮.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৪৬.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়" এবং ৯২৮.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (আরএলপি) (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প দুটি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি প্রকল্প প্রস্তাব ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পল্লী উন্নয়নের স্বার্থে প্রকল্পগুলোর দ্রুত অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ পাওয়া জরুরি।

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ)
দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ (বিবিএস-২০১৮) নারী। ফলে নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই অপরিহার্য শর্ত পূরণের লক্ষ্যে বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৪টি পর্যায়সহ অপরাপর ৫টি পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যাণ প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম গ্রামের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষাসহ নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য বিবেচনায় ১৯৯৭ সালে সরকার কর্তৃক বিআরডিবির মূল বাজেটের আওতায় 'মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ' নামে একটি পৃথক অনুবিভাগ সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে ।

যুব উন্নয়ন কর্মসূচি
দেশের হাজার হাজার গ্রামীণ যুবক স্বল্প আয়ের অথবা বেকার। এ সকল বেকার যুবকদের কিছু যুবক নিরক্ষর, কেউ কেউ অর্ধশিক্ষিত এবং কেউ শিক্ষিত। এ যুবক সমাজ কেবল তাদের বাবা-মা বা পরিবারেই নয় জাতির নিকটও ভারী বোঝা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তবে এ যুবকরাই নির্দিষ্ট কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। এ লক্ষ্যে ১৯৭৫-'৭৮ সালে আইআরডিপি কর্তৃক পাইলটিং হিসেবে ৪টি উপজেলায় যুব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে সারা দেশে যুব উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ১৯৮০ সালে জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স প্রোগ্রামটি শুরু হয়ে জুন ১৯৮২ তারিখে শেষ হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
বিআরডিবি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সফলতার সাথে অনেক দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে ১৩টি প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারি সিদ্ধান্তে কর্মসূচি আকারে এখনো চলমান। বিআরডিবি তার গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়/অনানুষ্ঠানিক দলভুক্ত করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পল্লীর দরিদ্র জনগণের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র নিজস্ব মোট ৪৬টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের-৩টি (একটি মহিলাদের), উপজেলাভিত্তিক টিটিডিসি-৩০৮টি, ইউটিইউ-২৩টি, ওয়ার্কসপ-কাম টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার-১০টি এবং ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন সেন্টার-৬টি। এসকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্প/কর্মসূচিভুক্ত জনবল ও উপকারভোগীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অতিসম্প্রতি সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি নিজস্ব উদ্যোগ ও সীমিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যেই নোয়াখালীর ভাসানচরে নির্মিত শরণার্থী পল্লীতে স্থানান্তরিত ও বসবাসকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও জীবিকায়ন সহায়ক কৃষি ও অকৃষি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সেচ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (আইএমপি)
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষের ক্ষেত্রে সেচযন্ত্র একটি অতি অপরিহার্য উপকরণ (কৃষিযন্ত্র) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় আইআরডিপি (বিআরডিবি) ১৯৭৯-'৮০ আর্থিক বছরে পরীক্ষামূলকভাবে দেশে সর্বপ্রথম আরডি-১ প্রকল্পের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনা (আইএমপি) কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তীতে এ কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিআরডিবি'র জন্মলগ্ন থেকেই ১৫টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮,৩৬০টি গভীর নলকূপ, ৪৪,৫২৩টি অগভীর নলকূপ, ১৯,৪০৫টি শক্তিচালিত পাম্প, ২,৭৩,০০০টি হস্তচালিত নলকূপ, ৯৫টি পাওয়ার টিলার এবং ৫টি ট্রাক্টরসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করেছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১৬টি সেচ ও সেচ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

পূর্ত কর্মসূচি
১৯৭৬ সাল হতে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তয়িত বিভিন্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোগত কাজ যথা : পাকা সড়ক নির্মাণ, কাঁচা সড়ক উন্নয়ন, পল্লী হাটবাজার নির্মাণ ও মেরামত, খালখনন, পুকুর খনন/পুকুর সংস্কার ও পুনঃখনন, ড্রেনেজ নালা, সেচ নালা নির্মাণ, মাঝারি মাপের ব্রিক কালভার্ট, পশুপালনের সেড ও পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ, কুটিরশিল্প উন্নয়নের সুবিধা কেন্দ্র নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ের অফিস ভবন, ব্যাচেলর ও টুইন কোয়ার্টার নির্মাণ এবং ইউনিয়ন অফিস ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণসহ ৬টি নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
সারাদেশে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে বাজারজাতকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বিআরডিবি আশির দশকের শুরুতে মুক্তা মার্কেটিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। বাজারজাতকরণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ইউসিসিএ, কেএসএস এর কৃষক সদস্যদের উন্নত জাতের বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহ এবং তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্বয়ম্ভরতা অর্জন। সারা দেশে এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের সর্বমোট ১৬৮টি গুদাম (শস্য সংরক্ষণাগার) নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষা কর্মসূচি
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জ্বালানী ঘাটতি পূরণ, দূষণমুক্ত বাস উপযোগী জনপদ সৃষ্টি এবং উপকারভোগীদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের আয়বর্ধনকল্পে বিআরডিবি সারাদেশে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন, উন্নত চুলা ব্যবহার ও সম্প্রসারণ, পশুপাখির টিকাদান ও পরিচর্যা, নারিকেলের চারা রোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করে আসছে ।

উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থাসমূহ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, বিশ্ব ব্যাংক, ইউএসএইড, কেয়ার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ডেনিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, কানাডিয়ান সিডা, সুইডিস সিডা, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা, জাতিসংঘের মূলধন উন্নয়ন তহবিল, বিশ্ব শিশু তহবিল, আইএলও, ইউএনএফপিএ, ইফাদ, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, জার্মান কারিগরি সহায়তা সংস্থা, নোরাড, ইইসি, জাইকা, আফ্রো এশিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা পেয়েছে।

বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক (বিষয়ভিত্তিক) সেবা গ্রহণ
বিআরডিবিতে ১৯৮৫ সাল থেকে ২০১০

সাল পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়ভিত্তিক ৬৯ জন বিদেশি বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক, ৬ জন অস্ট্রেলিয়ান ইয়ুথ অ্যাম্বেসেডর এবং ২৩৮ জন জেওসিভি সদস্যসহ মোট ৩১৩ জন কর্মরত ছিলেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে তারা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পল্লী উন্নয়নের অগ্রদূত হওয়ার যৌক্তিকতা

বিআরডিবি দেশের সার্বিক পল্লী উন্নয়নে বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সরকারের সর্ববৃহৎ সেবাদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে কৃষি উৎপাদন তথা পল্লী উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বহুমাত্রিক সার্বিক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৫০ বছর উত্তীর্ণ করেছে। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিসহ মোট ১১৮টির অধিক বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র সংস্থাটি বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে তার সক্ষমতার প্রমাণ রেখেছে। বিআরডিবি ব্যতীত অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান সার্বিক পল্লী উন্নয়নের জন্য এত অধিক সংখ্যক বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের নজির নেই। ফলে সার্বিকভাবেই বিআরডিবি বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য ।

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

শুরু হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আইআরডিপি তথা বিআরডিবি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জনসেবার মানোন্নয়নে প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, আইএমইডি, বিআইডিএস, বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাজ্যে'র একটি বিশ্ববিদ্যালয়, পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে স্থানীয় একজন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়ন বিষয়ে তিন জন বিদেশি পরামর্শক কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে ১২টি মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য

উদকনিক প্রকল্পের সেলাই প্রশিক্ষণ, বিআরডিবি, মিঠাপুকুর, রংপুর

বিমোচন ও জনসেবার মানোন্নয়নে সুনির্দিষ্ট প্রভাব নিরূপণ ও প্রতিফলনসহ বিআরডিবি'র কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। বিআইডিএস-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেশের জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমাণ ১.৯৩% উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার

বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ দেশের কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ উপকারভোগীদের সেবা ও স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফলে, পল্লী উন্নয়ন তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যুক্ত হয়েছে উন্নয়নের বহুমুখীতা এবং এর ফলস্বরূপ পল্লী অঞ্চলে বিনিয়োগ, উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ, উৎপাদন, আয়, ভোগ ও চাহিদা এবং স্ব-কর্মসংস্থান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল অর্জন গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল ও সুদৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি এক অনন্য প্রতিষ্ঠান এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সক্ষমতার প্রতীক। দেশের সার্বিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর এবং বিআরডিবি এ সেক্টরে সরকারের রাজস্ব খাতভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বিসিএস-সমবায় ক্যাডারভুক্ত সমবায় অধিদপ্তর থাকলেও বিসিএস-পল্লী উন্নয়ন ক্যাডারভুক্ত পল্লী উন্নয়ন অধিদপ্তর নেই। তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই দেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই ও স্থায়ী পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও গতিশীল ও সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম গতিশীল ও জোরদারকরণের জন্য পল্লী উন্নয়নের অগ্রদূত এ প্রতিষ্ঠানকে পল্লী উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তরসহ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অর্থাৎ বিসিএস-পল্লী উন্নয়ন ক্যাডারভুক্ত হওয়া জরুরি ও সময়ের দাবি।

দীপক রঞ্জন ভৌমিক, প্রাক্তন সিনিয়র কনসালটেন্ট, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিআরডিবি'র কার্যক্রমসমূহ ও জিডিপিতে অবদান : শ্যামনগর অভিজ্ঞতা

এস.এম.এ সোহেল

মাছে ভাতে বাঙালি। আমরা আমজনতা কথাটি বলতে ও শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে বিআরডিবি'র জয়গান বলতে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ ও শস্য বীজ বিতরণ, ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের আলোচনাই বেশি শুনা যায়। বিআরডিবির মাধ্যমে কৃষির যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তা নিয়ে অনেক তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা-প্রকাশনা থাকলেও কৃষিজ উৎপাদনের অন্যান্য খাতসমূহে আমাদের মনোযোগ কম, বিশেষ করে মৎস্য খাত। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক একথা সত্য যে, বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবির ভূমিকা অনস্বীকার্য; পাশাপাশি গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতেও বিআরডিবি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সমস্যা হলো, মোট কৃষিজ উৎপাদনে বিআরডিবির ভূমিকা কী, কীভাবেইবা বিআরডিবি উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণে ভূমিকা রাখছে, কীভাবেইবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ধীরে ধীরে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, তা তথ্য উপাত্তের অভাবে অনেক সময় সঠিকভাবে

চিত্রায়িত করা সম্ভব হয়নি। তবে এই ভিন্ন ভিন্ন অগ্রগতির দিকগুলো উন্মোচন করার সময় এসেছে।

বর্তমানে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন বেড়েছে। মোট কৃষিজ উৎপাদনের অন্যতম খাত হলো মৎস্য খাত। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫২ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৬.৩৭%) মৎস্য খাতের অবদান। বর্তমানে দেশে মাছের চাহিদা মিটিয়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৩৯ শতাংশ আসে মৎস্য খাত হতে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০)। দেশের মোট কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনীতিতে বিআরডিবি কীভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত অনেক উপজেলার উদাহরণ টানতে পারি। তবে একটি উপজেলার কথা না বললেই নয়।

শ্যামনগর, আয়তনে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উপজেলা। এটি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের পাদদেশে এই উপজেলার অবস্থান। এখানে লবণাক্ততার কারণে মিঠা পানির প্রবল সংকট রয়েছে। উপকূলীয় ও লবণাক্ত অঞ্চল হওয়ায় প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মানুষের সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মৎস্য ও সুন্দরবনের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে, বিশেষ করে হোয়াইট গোল্ড খ্যাত চিংড়ি এই এলাকার মৎস্য উৎপাদনের মধ্যে অন্যতম। দেশিয় চাহিদা পূরণের পর বিদেশেও এই চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এলাকার জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে । একই সাথে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

শ্যামনগর উপজেলায় বিআরডিবি'র প্রায় ২৩৬টি সমিতি রয়েছে, এর মধ্যে কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১২৪টি, মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা ৪৯টি, বাকিগুলো অনানুষ্ঠানিক সমিতি ও দল। এই সমিতিগুলোর প্রায় ৮,০০০ সদস্য রয়েছে, যার অধিকাংশ সদস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। গত ২০১৯-'২০ অর্থবছরে সমিতির সদস্যদের মাঝে প্রায় ১৫.০৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এ বছর অর্থাৎ চলতি ২০২০-'২১ অর্থবছরে প্রায় ১৭.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যার অধিকাংশ চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য খাতে বিনিয়োগ করা হবে। এখানে ঋণ পরিশোধের হার ৯৯.৫% শতাংশ, যা উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সক্ষমতা প্রমাণ করে।

উপজেলা মৎস্য অফিসের তথ্যমতে শ্যামনগর উপজেলায় চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা প্রায় ১৬,৫৩৮টি। এর মধ্যে বাগদা চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা ১৬,৩২৮টি এবং গলদা চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা ২১০টি। যার আয়তন যথাক্রমে ১৭,৫০০ ও ১১০ হেক্টর জমি এবং মোট আয়তন প্রায় ১৭,৬১০ হেক্টর জমি। এখানে হেক্টর প্রতি জমিতে গড়ে ৪৩৫ কেজি হিসেবে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন প্রায় ৭,৬১৩ মেট্রিক টন এবং গলদা চিংড়ি হেক্টর প্রতি জমিতে গড়ে ৭০৯ কেজি হিসেবে ৭৮ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়ে থাকে । এছাড়া অন্যান্য উৎস হতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও কুচিয়া উৎপাদন হয়ে থাকে। এই বিপুল পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিআরডিবি'র অধিকাংশ সমবায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে মৎস্য খাতের অগ্রগতির চিত্র এখানে টানছি কেন, অবশ্যই তার কারণ আছে বৈকি! মৎস্য উৎপাদনে দেশের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কিংবা সফলতা বলেন, এই সক্ষমতা তো হঠাৎ করে একদিনে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আর এই অর্জনে বিআরডিবি'র অবদান কতটুকু, তা তথ্য-উপাত্তের হিসেবের বেড়াজালে নিরূপণ নাই বা করলাম! কিন্তু খালি চোখে উপকূলীয় অঞ্চলে যা দেখা যায়, তা স্বীকার করতে অনেকের গবেষক হওয়ার প্রয়োজন হবে না। বিশেষ করে বিআরডিবি'র মাধ্যমে মৎস্যজীবী সমবায়ীদের সংগঠিত করা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহজ শর্তে সঠিক সময়ে অর্থের যোগান/সরবরাহ এ সকল কার্যক্রম ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থান তৈরিতে বিআরডিবি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে ।

বিআরডিবি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই শ্যামনগর উপজেলায় সফলতার সাথে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শ্যামনগর বিআরডিবি'র অধীনে পরিচালিত উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউসিসিএ) ১৯৮৮ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে জাতীয় পল্লী পদক লাভ করে, যা অত্যন্ত মর্যাদাকর। কিন্তু এই সম্মান ও মর্যাদার স্থায়ী রূপ প্রতিষ্ঠা করতে হলে কৃষিজ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত খাতসমূহে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও গবেষণা প্রয়োজন। তাহলে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান কতটা তা নিরূপণ করা সত্যিকার অর্থে সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তন ও কার্যকারিতা নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। এই ধারণার ভিত্তিতে পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের কারণে পল্লী সমাজব্যবস্থায় যে নব্য মহাজনি প্রথা চালু হয়েছিল, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ঋণের সহজীকরণের মাধ্যমে বিআরডিবি সেই মহাজনি প্রথার মগজে ধাক্কা মারার চেষ্টা করেছে। কতটুকু সফল, কতটুকু ব্যর্থ; সেটি বিবেচ্য নয় বরং পল্লী উন্নয়নে কৃষিজ উৎপাদনের সাথে প্রান্তিক কৃষক ও মহিলাদের যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে কি না, অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কি না, এটি আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

বর্তমান বিশ্বায়ন যুগে দারিদ্র্য মুক্তির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো শক্তিশালী অর্থনীতি। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর ইশারায় লক্ষ কোটি বাঙালি যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নের পথ ধরেই বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং পল্লী উন্নয়নে 'আমার গ্রাম-আমার শহর' এর যে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা রূপায়ণে বিআরডিবি-কে পিছিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক সমীক্ষায় জিডিপিতে বিআরডিবির অবদান ১.৯৩% উল্লেখ করা হয়েছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, পল্লী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি ও জাতীয় অর্থনীতিতে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে; ফলে জিডিপিতে বিআরডিবি'র গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয় । পরিশেষে আমরা বলতে পারি "পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি" -এটাই হোক পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাধিক উচ্চারিত স্লোগান।

এস.এম.এ সোহেল (ই-৩৭৯৫), প্রাক্তন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

বিআরডিবির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার নিচ্ছেন বিআরডিবিভুক্ত _কাশিমনগর বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ' এর সভাপতি জনাব মোঃ ইউনুস আলী-৫ নভেম্বর ২০১৬

বিআরডিবি'র ৫০তম বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী ভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে যশোর জেলায় বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

যশোর জেলায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

মহাপরিচালক বিআরডিবি কর্তৃক ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে মত বিনিময়।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক পল্লী ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন, উদকনিক প্রকল্প, রংপুর।

পল্লী ভবনে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে মাননীয় সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বিআরডিবি, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু।

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় উদকনিক প্রকল্পের সেলাই প্রশিক্ষণ উদ্বোধন, সনদপত্র বিতরণ ও উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি।

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে পল্লী ভবনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

পল্লীভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শনে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ইনহাউজ ট্রেনিং, বিআরডিটিআই, সিলেট।

জনাব আলহাজ্ব এ্যাড. আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি মহোদয় উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ ও গাছের চারা বিতরণ করেন, বিআরডিবি, কালিয়াকৈর গাজীপুর।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বিআরডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

কারুপল্লী পরিদর্শনে বিদেশী প্রতিনিধিদল

কোভিড ক্ষতিগ্রস্ত সুফলভোগীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করছেন জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি, বিআরডিবি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা